দূর দিগন্তে উঁকি

বিশ্বসাহিত্যের নির্বাচিত গল্পের অনুবাদ

চিনুয়া আচেবে | সেম্বেনে অটজমেন | গ্রাহাম সুইফট
ভ্যালদাস প্যাপেভিচ | ফ্রানজ কাফকা | নাতালিয়া গিনসবার্গ
অ্যামোস ওজ

অনুবাদ

জাকির তালুকদার

দূর দিগন্তে উঁকি

দূর দিগন্তে উঁকি

[জাকির তালুকদারের অনুবাদে অন্য ভাষার গল্প]

অগ্রদূত
অগ্রদূত অ্যান্ড কোম্পানি

দূর দিগন্তে উঁকি
[বিশ্বসাহিত্যের নির্বাচিত গল্পের অনুবাদ]
অনুবাদ: জাকির তালুকদার

প্রকাশক: মনি মহম্মদ রুহুল আমিন
অগ্রদূত অ্যান্ড কোম্পানি
১৯০, গফুর ভবন [নিচ তলা], এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪২০, ফেব্রুয়ারি ২০১৪
স্বত্ব: অনুবাদক
প্রচ্ছদ: সুধীন পটকর
প্রাকমুদ্রণ: গ্রাসরুট কম্পিনেট, মুদ্রণ: অরনেট প্রিন্টেক

---

door digante unki, a book of world's selected short story, translated by zakir talukder
published by moni mohammod ruhul amin
agrodoot & company, 190, gafur bhaban [ground floor], elephant road, dhaka-1205
+88 017 14 938109, +88 018 14 795007, +88 019 21 157330
agrodootbd@gmail.com, monimohammod76@gmail.com, ruhulamin_d@yahoo.com
first published: magh 1420, february 2014
cover design by sudheen patkar
pre-press: grassroot compinet, press: ornate printech

price tk. 200 us $ 20
ISBN: 978-984-90259-8-6

উৎসর্গ

ফজলুল আলম

মনস্বী,

বৈরী পৃথিবীতে শিশুর স্বভাব নিয়ে

জীবন কাটানো মানুষ

লেখকের অন্যান্য বই

গল্প

স্বপ্নযাত্রা কিংবা উদ্বাস্তুপুরাণ [১৯৯৭]
বিশ্বাসের আগুন [২০০০]
কন্যা ও জলকন্যা [২০০৩]
কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই [২০০৬]
রাজনৈতিক গল্প: হা-ভাতভূমি [২০০৬]
মাতৃহন্তা ও অন্যান্য গল্প [২০০৭]
The Uprooted Image [২০০৮]
গল্পসমগ্র-১ম খণ্ড [২০১০]
যোজনগন্ধা [২০১২]
বাছাই গল্প [২০১৩]

উপন্যাস

কুরসিনামা [২০০২]
হাঁটতে থাকা মানুষের গান [২০০৬]
বহিরাগত [২০০৮]
মুসলমানমঙ্গল [২০০৯]
পিতৃগণ [২০১১]
কবি ও কামিনী [২০১২]
ছায়াবাস্তব [২০১৩]

প্রবন্ধ

গল্পপাঠ [২০০১]
বাংলাসাহিত্যের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন [২০১১]

কিশোর সাহিত্য

চলনবিলের রূপকথা [২০০৪]
মায়ের জন্য ভালোবাসা [২০১২]

ছড়া

তিনতিড়ি [১৯৮৯]
নাইমামা কানামামা [১৯৯৫]

সম্পাদনা

প্রতিপাঠ: উত্তরআধুনিকতা [২০০২]
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প [২০০৮]
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প [২০০৮]
সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প [২০০৭]
আবদুশ শাকুরের শ্রেষ্ঠ গল্প [২০০৬]
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প [২০০৬]

অনুবাদ

আনা হ্যানা জোহ্যানা— মারিয়ান্নি ফ্রেড্রিকসন [২০০৩]
হেনরী কিসিঞ্জারের বিচার— ক্রিস্টোফার হিচেন্স [২০০৪]

মুখবন্ধ

ভাষিক বিবেচনায় আমি জাতীয়তাবাদী তো বটেই, প্রায় মৌলবাদীই বলা যায়। বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানসিকভাবে ভীষণ আপত্তি আমার। পড়তে গেলেও, যা বাংলাভাষাতে পাওয়া যায়, যত দুর্বল গদ্যেই লেখা হোক-না কেন, অন্য ভাষায় সেটি পড়তে চাই না। একসময়ে বেশ ভালোভাবেই আরবি শেখার চেষ্টা করেছিলাম। প্রায় ভুলেই গেছি। কারণ আরবি ভাষায় কোরআন ছাড়া অন্য কিছু শেষ পর্যন্ত আর পড়া হয়ে ওঠে না। এত এত হিন্দি সিনেমা দেখেও একটি পুরো বাক্য হিন্দিতে বলতে জানি না। ইচ্ছা করেই শিখিনি।

কিন্তু ইংরেজি না পড়ে তো উপায় নেই। ছাত্রজীবনে পাঠ্যপুস্তক পড়তে হয়েছে বাধ্য হয়ে। আর এখন পড়তে হয় অন্য সকল ভাষার সাহিত্য এবং মননের সাথে প্রাথমিক পরিচয়ের আশায়, সেই পরিচয়টিকে ঘনিষ্ঠ করে তোলার অন্তর্তাড়নায়। পড়ি। আর খুব ভালো লাগলে অনুবাদ করি। অনুবাদ করেছি গল্প-উপন্যাস-নিবন্ধ, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, দলিল-পত্রসহ নানাবিধ রচনা। সেগুলি কোনো কোনোটি বই হয়ে বেরিয়েছে, কোনোটি আবার হয়নি।

এই বইতে আটটি গল্প থাকছে। ফ্রানজ কাফকা এবং চিনুয়া আচেবেকে বাদ দিলে অন্য পাঁচ লেখক বাঙালি পাঠকসমাজে তেমন পরিচিত নন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইসরায়েলের অ্যামোস ওজ, সেনেগালের সেম্‌বেনে আউজমেন, ইতালির নাতালিয়া গিনসবার্গ, লিথুয়ানিয়ার ভ্যালদেস প্যাপেভিচ, ব্রিটিশ-আমেরিকান গ্রাহাম সুইফট।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি কিছুটা দ্বিচারী। একই গল্পের কিছু অংশ আক্ষরিক অনুবাদ করেছি, কিছু অংশ করেছি ভাবানুবাদ। প্রধানত নিজের পাঠের জন্যই অনুবাদ। অন্য পাঠক এটির স্বাদ নিতে চাইলে স্বাগতম!

জাকির তালুকদার
ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

সূ চি প ত্র

[১১—২৭]
যুদ্ধের মেয়েরা
চিনুয়া আচেবে

[২৮—৩২]
স্যান্ডি লেনে ভালোবাসা
সেম্‌বেনে আউজমেন

[৩৩—৪২]
হে পুত্র
গ্রাহাম সুইফট

[৪৩—৫৪]
আমি বাহিরে যাচ্ছি, আলোর সন্ধানে
ভ্যালদাস প্যাপেভিচ

[৫৫—৬১]
পল্লী চিকিৎসক
ফ্রানজ কাফকা

[৬২—৮৪]
কালাপানি দ্বীপে
ফ্রানজ কাফকা

[৮৫—৯৩]
মা
নাতালিয়া গিনসবার্গ

[৯৪—১১১]
বেদুঈন ও ভাইপার
অ্যামোস ওজ

যুদ্ধের মেয়েরা

চিনুয়া আচেবে

[জন্ম নাইজেরিয়ায়, ১৯৩০ সালের ১৬ নভেম্বর। মৃত্যু ২১ মার্চ ২০১৩। তাঁর ৫টি উপন্যাস আফ্রিকা তথা বিশ্বসাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ। এত বেশি পাঠক আর কোনো আফ্রিকান লেখক পাননি]

প্রথম সাক্ষাতে কিছুই ঘটেনি। বাতাসে যুদ্ধ শুরু হওয়ার উত্তেজনা। সেই সময়টাতে হাজার হাজার যুবক-তরুণ (এবং কখনো কখনো মহিলারাও) তালিকাভুক্তিকেন্দ্র থেকে নাম লিখিয়ে ফিরছিল। বুকে তাদের নতুন প্রাণবন্ত জাতিকে রক্ষার জন্য অস্ত্র তুলে নেবার শপথ।

দ্বিতীয়বার তাদের সাক্ষাৎ অকা-তে একটা চেকপোস্টে। ততদিনে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে উত্তর সেক্টর থেকে যুদ্ধ এগিয়ে আসছে দক্ষিণ দিকে। সে গাড়ি চালিয়ে আসছিল ওনিৎসা থেকে ইনুগুর দিকে। জলদি পৌঁছুনোর তাগিদ ছিল। বুদ্ধি দিয়ে সে বুঝতে পারত যে এই রকম সময়ে রাস্তায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সার্চ করার যুক্তি আছে, কিন্তু নিজে এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়লে কেন যেন অপমানিত বোধ করত। সে সামনা-সামনি স্বীকার হয়তো করবে না, কিন্তু মনে মনে ভাবত যে রাস্তায় যাদের সার্চ করা হয়, তারা সবাই সাধারণ মানুষ। কোনো হোমড়া-চোমড়াকে রাস্তায় এভাবে তল্লাশি করা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে সার্চ এড়িয়ে যেত অভিজাত ও কর্তৃত্বপরায়ণ কণ্ঠে এই কথা বলে— 'আমি রেজিনাল্ড ন্‌আনখো। মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস।' প্রায়শই এতে কাজ হত। কিন্তু মাঝে মাঝে অজ্ঞতার কারণে কিংবা স্রেফ গোঁয়ার্তুমি করেই কোনো কোনো চেকপোস্টে তার গাড়ি সার্চ করা হত। অকা-তেও সেটাই ঘটল। এখানে সার্চ করছে স্থানীয় ভিজিলেন্স টিম। শুধু দুইজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে হেভি মার্ক-ফোর রাইফেল কাঁধে নিয়ে।

একটি মেয়ে এগিয়ে আসছে তার গাড়ির দিকে। মেয়েটিকে লক্ষ করে সে বলল— 'আমার তাড়া আছে। আমার নাম রেজিনাল্ড ন্‌আনখো। আইন মন্ত্রণালয়ে কাজ করি।'

'গুড আফটারনুন স্যার! আমি আপনার গাড়ির বুট দেখতে চাই।'

'হায় যীশু! বুটে কী আছে বলে মনে করো তুমি?'

'আমি জানি না স্যার।'

সে পরাজিত ভঙ্গিতে নেমে গাড়ির পেছনে গেল, বুট খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাম হাতে চিমটি কাটতে লাগল নিচের ঠোঁটে। ভাবখানা— এরপরে কী?

বুট দেখা হলে জিগ্যেস করল— 'তুমি সন্তুষ্ট?'

'হ্যাঁ স্যার। আমি কি আপনার পিজিওন হোলটা দেখতে পারি?'

'হায় যীশু!'

'আপনাকে দেরি করিয়ে দেবার জন্য দুঃখিত স্যার।'

'শুধু আমার তাড়া আছে বলেই একথা বলেছি। ওই যে গ্লাভ-কম্পার্টমেন্ট। সেখানে তুমি কিছুই পাবে না।'

'ঠিক আছে স্যার, বন্ধ করুন।'

সে রিয়ার-ডোর খুলে উবু হয়ে সার্চ করতে শুরু করল সিটের তলা। এবার সে মেয়েটির দিকে প্রথমবারের মতো মনোযোগ দিয়ে তাকাল। অবশ্য দেখা শুরু হল পেছন থেকে। মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী। পরনের নীল ব্রেস্ট জ্যাকেট, খাকি জিনস, পায়ে ক্যানভাসের জুতা, এবং চুল বাঁধার স্টাইল তার চেহারার মধ্যে একটা স্পর্ধার ভাব এনে দিয়েছে। এই ভঙ্গিটাকে তারা নিজেদের মধ্যে 'এয়ারফোর্স বেজ' বলে। তার কাছে মেয়েটাকে চেনা চেনা মনে হল।

'ঠিক আছে স্যার।' অর্থাৎ তার কাজ শেষ হয়েছে। এবার বলল— 'আপনি আমাকে চিনতে পারেননি স্যার?'

'না। আমি ঠিক...'

'আপনি আমাকে ইনুগু-তে লিফট দিয়েছিলেন একবার। আমি তখন স্কুল ছেড়ে মিলিশিয়াতে যোগ দিতে যাচ্ছিলাম।'

'ও তুমিই সেই মেয়ে! আমি তো তখন তোমাকে স্কুলে ফিরে যেতে বলেছিলাম। কারণ মিলিশিয়াতে মেয়েদের নেওয়া হত না। তুমি কি যোগ দিতে পেরেছিলে?'

'ওরাও আমাকে স্কুলে ফিরে যেতে বলেছিল। অথবা রেডক্রসে যোগ দিতে।'

'তার মানে আমার কথাটা ঠিক ছিল। তা তুমি এখানে কী করছ?'

'বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগে কাজ করছি।'

'ভালো। তোমার জন্য আমার শুভকামনা রইল। বিশ্বাস কর, তুমি একটা অসাধারণ মেয়ে।'

তার বিশ্বাস, সময়টাতে বিপ্লবী কিছু একটা ছিল। এখন প্রচুর তরুণী ও মহিলাকে মার্চপাস্ট করতে দেখা যায়। তবে এ নিয়ে সে খুব গভীরভাবে চিন্তা করেনি কখনো। মেয়েরা ব্যাপারটাকে সিরিয়াস ভাবে নিয়েছে কিনা সে ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। নিয়েছে। কিন্তু বাচ্চারা রাস্তায় যখন মার্চপাস্ট করে হাতে লাঠি আর তাদের মায়েদের স্যুপের বাটিকে মাথার হেলমেট বানিয়ে, তার কাছে মেয়েদেরটাকেও একই রকম মনে হত। তার বন্ধুদের মধ্যে এই সময়ের প্রচলিত সেরা জোক হচ্ছে— স্থানীয় মাধ্যমিক স্কুলের মেয়েরা মার্চ করে যাচ্ছে, তাদের পেছনে একটা ব্যানার— 'আমরা এখন গর্ভবতী হবার যোগ্য।'

অকা-র চেকপোস্ট পেরোনোর পরে সে শুধু মেয়েদের কথা ভাবছিল না, বিপ্লব নিয়ে বাদানুবাদের কথাও নয়। কারণ সে এইমাত্র দেখে এল মেয়েটি কত সিরিয়াসলি, কত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে কাজটিকে। মেয়েটার ভঙ্গি ছিল নিবেদিতপ্রাণ। কী বলল মেয়েটা? আমরা সেই কাজটাই করছি যে কাজের দায়িত্ব আপনারা আমাদের দিয়েছেন। যে তার উপকার করেছে তাকেও মেয়েটা কোনো ছাড় দিচ্ছে না। সে নিশ্চিত, মেয়েটা তার নিজের বাপকেও একই একাগ্রতা নিয়ে সার্চ করবে।

তৃতীয়বার তাদের যোগাযোগ হল কমপক্ষে আঠারো মাস পরে। দেশের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। মৃত্যু এবং ক্ষুধায় তাদের উন্মাদনা নেতিয়ে পড়েছে। আছে শুধু হালছাড়া ভাব। কোথাও কোথাও পাথুরে নির্লিপ্ততা এবং আত্মধ্বংসী অবহেলা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এই সময়েও কিছু লোক আছে যাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যা কিছু ভালো পাওয়া যায় তা হাতিয়ে নেওয়া এবং নিজেদের গণ্ডির মধ্যে আনন্দ-ফুর্তিতে দিন কাটানো। তাদের কাছে এটা অদ্ভুত হলেও যেন আগের সেই সাধারণ পৃথিবীটাই আছে। আগের সমস্ত চেকপোস্ট উঠে গেছে। তরুণীরা আবার তরুণীতে এবং যুবকরা সাধারণ যুবকে রূপান্তরিত হয়েছে। এটা যেন এমন বদ্ধ সংকুচিত একটা পৃথিবী, কিন্তু সর্বস্ব হারায়নি এখনো; এখানে ভালোও আছে, মন্দও আছে। বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা ঘটছে অনেক। কিন্তু সেগুলো ঘটে চলেছে সাধারণ মানুষের চক্ষুর অগোচরে, শরণার্থী শিবিরে, ছিন্নভিন্ন বসতিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে— যেখানে ক্ষুধা এবং খালিহাতের সাহস নিয়ে সৈনিকরা যুদ্ধরত। সম্মুখ-সমরে বুক পেতে দিচ্ছে গুলির সামনে।

রেজিনাল্ড তখন থাকত ওয়েরি-তে। কিন্তু সেদিন তাকে রেশনের জন্য যেতে হয়েছিল ন্‌খয়েরি-তে। কারিতাসের মাধ্যমে রেশন হিসেবে সে ওয়েরি-তে পেয়েছিল কয়েকটা শুঁটকি মাছের মাথা, কিছু টিনজাত মাংস, আর ফর্মুলা টু নামক

একটি ভয়ংকর আমেরিকান খাদ্য, যেগুলো তার মতে মূলত পশুখাদ্য। কিন্তু তার ধারণা ছিল সে ক্যাথলিক না হওয়ার কারণেই কারিতাস তাকে যথেষ্ট রিলিফ দেয় না। সে তাই ন্‌খয়েরি-তে গিয়েছিল তার এক বন্ধুর কাছে। তার বন্ধু ডব্লিউসিসি-র ডিপো ইনচার্জ। সেখানে সে বন্ধুত্বের সুবাদে পায় অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী। যেমন চাল, ডাল এবং একটি চমৎকার শস্য— যাকে বলা হয় গ্যাবন গ্যারি।

সে ওয়েরি থেকে বেরিয়েছিল ঠিক ছটায়। কারণ সে জানত সাড়ে আটটার মধ্যে না পৌঁছুলে তার বন্ধুকে পাওয়া যাবে না। কারণ সাড়ে আটটার পরে এয়ার রেইড বা বোমাবর্ষণের আশঙ্কা থাকায় তার ডিপো-ইনচার্জ বন্ধু ওই সময়ে কিছুতেই বাইরে থাকবে না। ন্‌আনখোর কপাল ওইদিন সত্যিই খুব ভালো ছিল। আগের দিন অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচুর মালামাল এসে পৌঁছেছে ডিপোতে। কারণ কয়েকটি মালবাহী বিমান নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রিলিফ নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তার ড্রাইভার টিন, ব্যাগ আর কার্টনগুলো গাড়িতে তোলার সময় চারপাশে ছিল ক্ষুধার্ত জনতা, যারা রিলিফের জন্য অপেক্ষা করছিল অনেক ঘণ্টা ধরে। তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এল অভব্য কয়েকটি শব্দ— যুদ্ধ চলতে থাকুক! ওয়ার ক্যান কন্টিনিউ। তার মানে ডব্লিউসিসি! একজন চেঁচিয়ে উঠল— 'ইররোভিলু!' অন্যরা সমস্বরে স্লোগান দিল— 'সাম!'

'ইররোভিলু!' 'সাম!'

'ইসোফেলি?' 'সাম!'

ইসোফেলি?' সাম!'—'ম্‌বাই'

ন্‌আনখো এই হাড়জিড়জিড়ে কাকতাড়ুয়া জনতার বিদ্রূপ শুনে নয়, বরং প্রচণ্ড বিরক্ত হচ্ছিল অপুষ্ট শরীর এবং গর্তে-ঢোকা চোখের লোকগুলোর মৌলিক দোষারোপের চেহারা দেখে। যদি লোকগুলো কিছুই না বলে নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখত ন্‌আনখোর গাড়ির বুটে তোলা হচ্ছে দুধ, ডিম, যব, টিনভর্তি মাংস এবং শুঁটকি মাছ, তাহলেই বরং সে বেশি বিব্রত বোধ করত। প্রকৃতিগতভাবেই একদল হতভাগা লোকের মধ্যে একজন মাত্র সৌভাগ্যবানের উপস্থিতির বিষয়ে চিন্তা করলেই সে বেশি বিব্রত বোধ করে। কিন্তু একজন মানুষ আর কীই-বা করতে পারে! তার স্ত্রী এবং চার সন্তানকে সে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে বহুদূরের গ্রাম ওগবু-তে এবং সে যতটুকু রিলিফের খাদ্য পাঠাতে পারে তাদের জন্য, তার ওপরে নির্ভর করেই বেঁচে থাকতে হয় ওদের। সে তো আর নিজের পরিবারকে অপুষ্টিতে আক্রান্ত হতে দিতে পারে না। বড়জোর সে যা করতে পারে, যদি আজকের মতো বেশি দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহলে কিছুটা উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে দিতে পারে তার ড্রাইভার জনসনকে। সে অবশ্য তা করেও থাকে, কেননা বেচারা ড্রাইভারের বোঝাও অনেক বড়— স্ত্রী এবং ছয় সন্তান কিংবা সাত সন্তান। মাসে দশ পাউন্ড

বেতনে তার চলেই-বা কীভাবে, যেখানে জিনিসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে বাড়তে এককাপ গ্যারির দাম উঠেছে এক পাউন্ডে। এইরকম পরিস্থিতিতে কেউই জনগণের জন্য কিছু করতে পারে না। কেউ বড়জোর তার ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশীকে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। বড়জোর এটুকুই সম্ভব।

ওয়েরি-তে ফেরার সময় পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা খুব আকর্ষণীয় এক তরুণী লিফট চাইল। সে ড্রাইভারকে বলল গাড়ি রুখতে। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরল দশ-বারোজন মানুষ। ধুলি-ধূসরিত, কেউ সামরিক, কেউ বেসামরিক লোক।

'না না না।' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল ন্‌আনখো— 'আমি শুধু ওই তরুণীর জন্য গাড়ি থামিয়েছি। আমার গাড়ির টায়ার খারাপ। শুধু একজনকেই নিতে পারব। তার বেশি নয়। দুঃখিত।'

এক বৃদ্ধা হাতল চেপে ধরে কেঁদে উঠল— 'দয়া করো বাবা!'

'বুড়ি, তুই কি মরতে চাস?' এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল ড্রাইভার। ন্‌আনখো ততক্ষণে একটা বই খুলে তার পাতায় চোখ ডুবিয়ে দিয়েছে। প্রায় এক মাইল পেরোনোর আগে সে মেয়েটার দিকে তাকালই না। মেয়েটা প্রথম কথা বলা না পর্যন্ত। মেয়েটা কথা বলল, কারণ তার মনে হচ্ছিল নৈঃশব্দ্য বড় বেশি চেপে বসেছে। সে বলল— 'আজ আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। ধন্যবাদ! অনেক ধন্যবাদ!'

'মোটেই নয়। তুমি কোথায় যাবে?'

'ওয়েরি। আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি?'

'উ...হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই চিনেছি। কী বোকা আমি! তুমি হচ্ছ... তুমি হচ্ছ...'

'গ্ল্যাডিস।'

'ঠিক! সেই মিলিশিয়া মেয়ে। তুমি বদলে গেছ গ্ল্যাডিস। তুমি সবসময়েই সুন্দরী ছিলে, কিন্তু এখন তুমি একেবারে বিউটি কুইন। তুমি কী করছ?

'আমি জ্বালানি বিভাগে আছি।'

'খুব ভালো কথা।'

ভালো কথা, সে ভাবল। কিন্তু কথাটা যতখানি ভালো, তারচেয়ে অনেক বেশি দুঃখজনক। মেয়েটার পরনে একটা চকচকে উইগ, দামি স্কার্ট, লো-কাট ব্লাউজ। তার জুতো গ্যাবনে তৈরি। নিঃসন্দেহে অনেক দামি। ন্‌আনখো বুঝে নিল, মেয়েটা এখন কোনো সুবিধাভোগী ধনীর রক্ষিতা, যে লোক যুদ্ধের সুযোগে টাকার পাহাড় গড়েছে।

'আমি তোমার জন্য আজ আমার নিজের নিয়ম ভঙ্গ করেছি। আমি এখন কাউকে

লিফট দেই না।'

'কেন?'

'তুমি কতজনকে লিফট দেবে? সে কারণে একেবারে সবাইকে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। ওই বৃদ্ধা মহিলার কথা ভাবো।'

'আমি মনে করেছিলাম আপনি ওই মহিলাকে গাড়িতে নেবেন।'

সে কোনো উত্তর দিল না। গাড়ির মধ্যে আরেক দফা নৈঃশব্দ্য। গ্ল্যাডিস ভাবল তার কথায় নৃআনখো রাগ করেছে। সে-ই আবার নীরবতা ভাঙল— 'আমার জন্য আপনার নিয়ম ভেঙেছেন বলে ধন্যবাদ।'

সে গ্ল্যাডিসের দিকে ফিরে হাসল— 'তুমি ওয়েরিতে যাচ্ছ কেন?'

'আমার এক বান্ধবী আছে। ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'বান্ধবী? ঠিক তো?'

'কেন নয়...ওর বাড়ির দরজায় গাড়ি থামিয়ে আমাকে নামিয়ে দেওয়ার সময় আপনি নিজেই তাকে দেখতে পাবেন। আমি শুধু প্রার্থনা করছি, ও যেন উইকএন্ড কাটাতে না চলে যায়। তাহলেই সর্বনাশ!'

'কেন?'

'কারণ যদি তাকে বাড়িতে না পাই, তাহলে আমাকে আজ রাস্তায় থাকতে হবে।'

'আমি প্রার্থনা করি, সে যেন ঘরে না থাকে।'

'কেন?'

'কারণ সে যদি ঘরে না থাকে, তাহলে আমি তোমাকে আমার ঘরে রাত্রিবাস এবং নাস্তার আমন্ত্রণ জানাব। ...এটা কী হল?' শেষের কথাটা ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলা। কারণ হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। তবে উত্তরের প্রয়োজন ছিল না। সামনেই জটলা। লোকজন তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তিনজনই হুড়মুড় করে গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিল কাছের ঝোপের দিকে। দৌড়াচ্ছে আর ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। কিন্তু এটা ছিল ফলস অ্যালার্ম। ভুল সতর্ক সংকেত। আকাশ পরিষ্কার, নীল। ভেসে বেড়াচ্ছে শুধু একজোড়া শকুন। জটলার মধ্যে একজন রসিকতা করে বলল— 'ওদের একটা হচ্ছে ফাইটার প্লেন, আরেকটা বোমারু বিমান।' অন্যেরা জোরে হেসে উঠল। ওরা তিনজন গাড়িতে উঠে ফের যাত্রা শুরু করল।

'রেইড এত সকালে শুরু হয় না।' গ্ল্যাডিসকে বলল সে। গ্ল্যাডিসের হাত দুটো তখনো নিজের বুকে চেপে ধরা, হৃৎপিণ্ড তখনো পাম্প করছে খুব জোরে। 'দশটার আগে বিমান হামলা হয় না বললেই চলে।'

কিন্তু ভয়ে গ্ল্যাডিসের মুখে তখনো কোনো শব্দ নেই। নৃআনখো সুযোগ খুঁজছিল।

পেয়েও গেল। এবং তৎক্ষণিকভাবে কাজে লাগাল গ্ল্যাডিসের ভীতিকে— 'তোমার বন্ধু কোথায় থাকে?'

'২৫০ ডগলাস রোড।'

'ওহ! শহরের একেবারে কেন্দ্রে। ভয়ংকর জায়গা। কোনো বাংকার নেই, আত্মরক্ষার মতো কিচ্ছু নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দেব সন্ধ্যা ছয়টার আগে সেখানে না যেতে। বিপদ হতে পারে। যদি কিছু মনে না করো, আমি তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। ছয়টা বাজলে পৌঁছে দেব তোমার বন্ধুর কাছে। তখন যাওয়া নিরাপদ। তোমার কী মত?'

'ঠিক আছে।' গ্ল্যাডিস মনমরা— 'বিমান হামলাকে আমি খুবই ভয় পাই। সেই কারণেই আমি ওয়েরি-তে কাজের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। আজ যে কেন বের হলাম কে জানে!'

'তোমার কোনো বিপদ হবে না। আমরা এভাবেই বসবাস করে চলেছি।'

'কিন্তু বাড়িতে আপনার পরিবারের লোকজন?'

'না।' সে বলে— 'কারো পরিবারই এখন শহরে থাকে না। কারণ হিসেবে বলা হয় বিমান হামলার কথা। কিন্তু আসলে আরো কারণ আছে। ওয়েরি হচ্ছে সত্যিকারের উদ্দাম শহর। আমরা সেখানে সমকামী ব্যাচেলরের মতো জীবনযাপন করি।'

'আমি এইরকম কথা শুনেছি।'

'শুধু শোনা নয়, আজ রাতে তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে। আমি তোমাকে সত্যিকারের একটা উদ্দাম পার্টিতে নিয়ে যাব। আমার এক লেফটেন্যান্ট-কর্নেল বন্ধুর জন্মদিনের পার্টি। আমি নিশ্চিত তুমি খুব এনজয় করবে পার্টিটা।'

নিজের প্রগল্‌ভতায় সে নিজে লজ্জিত হল একটু। সে এই ধরনের পার্টিকে ঘৃণা করে। অথচ এখন প্রশংসা করছে শুধু এই মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষায়। বিশেষ করে এই চমৎকার মেয়েটিকে সে একসময় সুন্দর জীবনের জন্য প্রত্যক্ষ ও রক্তাক্ত যুদ্ধে অংশ নিতে দেখেছিল। এবং কোনো সন্দেহ নেই, তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে তার শ্রেণিরই কিছু মানুষ। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। সে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল।

'কী হল?' জিগ্যেস করল গ্ল্যাডিস।

'তেমন কিছু না। এই একটা কথা ভাবছিলাম।'
ওয়েরি পর্যন্ত পথে আর একটি কথাও হল না।

বাড়িতে পৌঁছে মেয়েটি এমন সহজ আচরণ করতে শুরু করল যেন সে তার পুরনো প্রেমিকা।
সে তার বাদামি উইগ খুলে পোশাক বদলে নিল।

'এবার তোমার সুন্দর চুলটা দেখা যাচ্ছে। উইগ দিয়ে ঢেকে রেখেছিলে কেন?'

'ধন্যবাদ।' প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল গ্ল্যাডিস। একমুহূর্ত ভেবে বলল— 'পুরুষরা অদ্ভুত।'

'কেন বলছ একথা?'

'তুমি এখন বিউটি কুইন।' ন্‌আনখোর বলা কথাটা এবং ভঙ্গিটাও পুরোপুরি নকল করল গ্ল্যাডিস।

'ও এই কথা! তবে আমি কথাটা বলেছি মন থেকেই, সত্যি সত্যি।'

সে মেয়েটিকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেল। মেয়েটি প্রত্যাখ্যান করল না। আবার পরিপূর্ণ সাড়াও দিল না। সম্মানজনকভাবে শুরু করার জন্য এটা দরকার। এই সময় খুবই সহজলভ্য হয়ে গেছে মেয়েরা। কেউ একজন বলেছিল, এটা হচ্ছে যুদ্ধের অসুখ।

মেয়েটাকে রান্নাঘরে বাবুর্চিকে সাহায্য করতে পাঠিয়ে সে অফিস থেকে জাস্ট ঘুরে আসার কথা বলে বেরিয়ে এল। ফিরে এল ঠিক আধাঘণ্টা পরেই। হাত কচলাতে কচলাতে জানাল, সে তার বিউটি কুইনকে ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারল না।

দুপুরে খেতে বসে মেয়েটি বলল— 'আপনার ফ্রিজে প্রায় কিছুই নেই।'

একটু অপমানিত বোধ করল সে— 'তার মানে?'

'যেমন মাংস।' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল মেয়েটি।

সে চ্যালেঞ্জ করার ভঙ্গিতে বলল— 'তুমি কি এইরকম সময়ে মাংস খেতে পাও?'

'আমি কোথায় পাব মাংস! তবে আপনাদের মতো বড় মানুষদের ঘরে তো মাংস থাকার কথা।'

'আমি বুঝতে পারছি তুমি কোন ধরনের বড় মানুষের কথা বলছ। কিন্তু আমি ঠিক তাদের মতো নই। আমি জাতির শত্রুদের সাথে ব্যবসা করি না। অথবা রিলিফের মাল বিক্রি করি না। কিংবা...'

'অগাস্টার বয়ফ্রেন্ডও তো ওসব করে না। সে শুধু বিদেশি টাকা পায়।'

'কীভাবে সে বিদেশি টাকা পাবে! সে নিশ্চয়ই সরকারের সঙ্গে প্রতারণা করে। যে-ই হোক, একমাত্র অন্যায়ভাবেই বিদোশ টাকা পাওয়া সম্ভব। যাহোক, অগাস্টা কে?'

'আমার বান্ধবী।'

'বুঝতে পারলাম।'

'একবার অগাস্টা আমাকে তিন ডলার দিয়েছিল। ভাঙ্গিয়ে আমি পেয়েছিলাম

পঁয়তাল্লিশ পাউন্ড। অগাস্টার বয়ফ্রেন্ড প্রতিমাসে ওকে পঞ্চাশ ডলার করে দেয়।'

'বেশ। শোনো মেয়ে, আমি বিদেশি ডলার পাই না। এবং আমার ফ্রিজে মাংসও নেই। আমরা এখন একটা যুদ্ধের মধ্যে আছি। এবং আমি জানি যে আমাদের তরুণ সৈনিকরা খেতে পায় শুধু গ্যারি আর পানি। সেটুকুও তারা পায় তিন দিন পরপর।'

'কথাটা সত্যি।' মেয়েটা স্বীকার করে— 'বানর খেটে মরে, বেবুন মজা মারে।'

'এটা তার চেয়েও খারাপ!' তার গলা কাঁপছে— 'প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে। এই যে আমরা কথা বলছি, এই সময়টুকুর মধ্যেও কেউ না-কেউ মারা যাচ্ছে।'

'কথাটা সত্যি।' আবারও বলল মেয়েটা।

'বিমান!' রান্নাঘর থেকে চিৎকার ভেসে এল বাবুর্চির।

'ও মাগো!' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল গ্ল্যাডিস।

বাংকারের মধ্যে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে আছে ওরা। মাথার উপরের আকাশটা কাঁপছে জেটবিমানের শব্দে। আর পাশের অন্য কোনো সামরিক বাংকার থেকে মুহুর্মুহু গর্জে উঠছে স্থানীয়ভাবে তৈরি অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট রকেট।

একসময় মিলিয়ে গেল বিমানের শব্দ। নিথর হয়ে পড়ল রকেট-লাঞ্চারগুলোও। কিন্তু তখনো, বাংকারের মধ্যে গ্ল্যাডিস প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে তাকে।

'প্লেনগুলো শুধু টহল দিয়ে গেল মনে হয়।' তার গলাও শুকনো— 'ওরা বোমা ফেলেনি। সম্ভবত যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পথে একটু মহড়া দিয়ে গেল। সবসময় এই রকমই হয়। আমাদের সৈন্যরা ওদের ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেই ওরা রাশিয়া বা মিশরের কাছে প্লেন চেয়ে জরুরি বার্তা পাঠায়।' একনিশ্বাসে কথাগুলো বলে সে লম্বা করে নাক টানল।

মেয়েটা কিছু না-বলে তাকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরল। ওরা শুনতে পেল, বাবুর্চি পাশের বাড়ির কাজের লোককে বলছে যে প্লেন ছিল দুইটি, এবং ওরা এইভাবে এইভাবে ডাইভ দিচ্ছিল।

'আমিও দেখেছি।' অপর জনও বলল উত্তেজিত কণ্ঠে— 'আমাদের সৈন্যরা ওদের তাড়িয়ে না দিলে ওরা আমাদের ফ্রিজের মিষ্টিগুলো পর্যন্ত কেড়ে নেওয়ার জন্য মানুষ খুন করতে পারে।'

'কল্পনা করা যায়!' বলল গ্ল্যাডিস। অবশেষে সে কথা বলার মতো শক্তি ফিরে পেয়েছে।

ইতোমধ্যে ন্‌আনখো বুঝে নিয়েছে গ্ল্যাডিসের কথা বলার ভঙ্গি। মেয়েটা অল্প শব্দে, কখনো-বা একটিমাত্র শব্দে পুরো পরিবেশকে ইঙ্গিত করতে পারে। এখন এই

সংক্ষিপ্ত বাক্যটি দিয়ে সে তার আশ্চর্য হওয়ার কথা বোঝাচ্ছে। সে আশ্চর্য হয়েছে, এই রকম মৃত্যুর মুখেও মানুষ এমন হালকাভাবে কথা-বার্তা চালাতে পারে দেখে।

'এত ভয় পেয়ো না।' সে বলল। উত্তরে কোনো কথা না-বলে গ্ল্যাডিস আরো কাছে সরে এল। সে তখন মেয়েটিকে চুমু খেতে শুরু করল। হাত দিল বুকে। মেয়েটিও সাড়া দিতে শুরু করল। একসময় সাড়া দিল পুরোপুরি। বাংকারের ভেতরটা অন্ধকার। অপরিষ্কারও। পোকামাকড় থাকতে পারে। সে একবার ঘর থেকে একটা মাদুর নিয়ে আসার কথা ভাবল। কিন্তু পরক্ষণেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলল ভাবনাটা। ইতোমধ্যে আরেকটা প্লেন এসে পড়তে পারে। তখন হয়তো আরো মানুষ ঢুকে পড়বে বাংকারের মধ্যে। তাহলে ঘটনা দাঁড়াবে সেই রকম, যা ঘটেছিল আরেকটা এয়ার রেইডের সময়। সে সময় একজন ভদ্রলোককে দেখা গেল বাংকার থেকে বেরিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ছুটছে নিজের বেডরুমের দিকে। পেছনে পেছনে ছুটছে একজন উলঙ্গ মহিলা। প্রকাশ্য দিবালোকে।

গ্ল্যাডিসের ভয়টাই সত্যি হল। তার বান্ধবী শহরে নেই। হয়তো তার প্রভাবশালী বয়ফ্রেন্ড তাকে নিয়ে লিবারভিলে গিয়েছে প্লেনে করে কেনা-কাটার উদ্দেশ্যে। প্রতিবেশীরা যা খুশি ভাবুক!

'দারুণ!' ফিরে আসার সময় গাড়ি চালাতে চালাতে বলছিল ন্‌আনখো— 'তোমার বান্ধবী ফিরে আসবে যুদ্ধবিমানে। কিন্তু বিমানে অস্ত্রের বদলে থাকবে জুতো, পরচুলা, প্যান্টি, ব্রা, কসমেটিক। ওসব সে এখানে বিক্রি করে লাভ করবে হাজার হাজার পাউন্ড। তোমরা মেয়েরা সত্যিসত্যিই যুদ্ধের মধ্যে আছ, তাই না?'

উত্তরে গ্ল্যাডিস কিছু না-বলায় ন্‌আনখো ভাবল এবার তাকে বাগে পাওয়া গেছে। ঠিক তখনই গ্ল্যাডিস বলে উঠল— 'আপনারা পুরুষরা চেয়েছেন আমরা যেন ঠিক এইভাবেই চলি।'

'বেশ!' সে বলল— 'এখানে একজন পুরুষ আছে যে চায় না যে তুমি ওইভাবে চলো। তোমার কি খাকি জিনস পরা সেই মেয়েটার কথা মনে আছে যে চেকপোস্টে আমার গাড়িটা সার্চ করেছিল কোনো দয়া-মায়া না দেখিয়ে?'

মেয়েটা হাসতে শুরু করল।

'আমি তোমাকে সেই মেয়ে হিসেবেই দেখতে চাই আবার। তোমার কি মনে আছে তার কথা? তার মাথায় তখন কোনো উইগ ছিল না। আমার মনে হয় তার কানে তখন কোনো দুল পর্যন্ত ছিল না...'

'না না, এই কথাটা ঠিক নয়। আমার কানে তখন দুল ছিল।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে আমি কী বলতে চেয়েছি?'

'সেই সময়টা এখন আর নেই। এখন সবাই চায় কোনোরকমে বেঁচে থাকতে। লোকে এই পর্যায়টাকে বলে ছয় নম্বর। আপনি আপনার ছয় নম্বর নিয়ে ব্যস্ত; আমি আমার। এভাবেই চলছে।'

লেফটেন্যান্ট-কর্নেলের পার্টি এমন দিকে বাঁক নেবে কেউ ভাবতে পারেনি। কিছুক্ষণ আগেও পার্টি চলছিল মসৃণভাবে। ছিল খাসির মাংস, মুরগির মাংস আর প্রচুর পরিমাণে ঘরে তৈরি মদ। পার্টিতে উত্তেজক দ্রব্য বলতে ছিল এই একটাই। এগুলোকে বলা হয় 'ট্রেসার'। পেট থেকে গলা পর্যন্ত গরম করে তোলে এই জিনিস। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এগুলোকে রাখা হয়েছিল নির্দোষ পানীয়ের মতো কমলার রসের বোতলে। কিন্তু যে জিনিসটি পার্টিতে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলল তা হচ্ছে— রুটি। প্রত্যেকের জন্য, ছোট হলেও, একটা করে রোল। আকারে গলফ-বলের সমান; শক্তও বলের মতোই। কিন্তু ওটা ছিল সত্যিকারের রুটিই। বাজনাটাও চমৎকার। আর ছিল প্রচুর মেয়ে। পরিবেশ আরো উন্নত হয়ে উঠল রেডক্রসের দুই লোক আসাতে। একজনের হাতে স্কচের বোতল, আরেকজনের হাতে কর্ভাজারের বোতল। বোতল হাতে তাদের ঢুকতে দেখেই পার্টির সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এক ফোঁটা হলেও প্রসাদ পাওয়ার জন্য। ফলে পরিবর্তিত হয়ে গেল পার্টির এতক্ষণের চরিত্র। এইটুকু সময়ের মধ্যেই এক শ্বেতাঙ্গ বেশি মদ টেনে মাতাল হয়ে পড়েছিল। বেশি মদ খাওয়ার যুক্তি হিসেবে সে বলেছে যে তার বন্ধু গতরাতে মারা গেছে প্লেনক্রাশে। সে রিলিফ নিয়ে যাচ্ছিল।

পার্টির কয়েকজন লোক শুনতে পেয়েছে তার কথা। সুতরাং তৎক্ষণাৎ সহমর্মিতা জানিয়ে কিছুটা আফসোসের শব্দ হল বাতাসে। নাচে মগ্ন কয়েকটা যুগল নাচ বন্ধ করে বসে পড়ল নিজেদের চেয়ারে। থেমে গেল বাজনা। তখন কী একটা অদ্ভুত কারণে রেডক্রসের মাতাল লোকটা ফেটে পড়ল ক্ষোভে— 'কেন একজন মানুষকে, একজন সুন্দর মানুষকে এভাবে জীবন দিতে হয়! কোনোই কারণ নেই। চার্লি মরতে চায়নি। এই নোংরা দুর্গন্ধমাখা জায়গাতে মরতে চায়নি। হ্যাঁ, এখানে সবকিছুতেই দুর্গন্ধ। এমনকি যে মেয়েরা এসেছে, পুতুলের মতো সেজেছে, হাসছে— ওদের চেয়ে নষ্ট আর কী আছে? আমি কি জানি না? একটা আমেরিকান ডলার কিংবা একটা শুঁটকি মাছের মাথা দেখালেই ওরা সুড়সুড় করে বিছানায় গিয়ে উঠবে।'

পার্টিতে নেমে এল ভীতিকর নৈঃশব্দ্য।

হঠাৎ একজন যুবক অফিসার উঠে দাঁড়াল। হেঁটে গেল তার কাছে। গুণে গুণে তার গালে চড় কষাল তিনটা— ডান! বাম! ডান! তাকে উঁচু করে তুলে নিল চেয়ার থেকে (তার চোখে তখন অশ্রুর মতো কিছু একটা ঝরছিল)। তারপর ছুঁড়ে দিল বাইরের দিকে। তার বন্ধু তাকে রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা অবশ্য করেছিল। সে-ও

এবার বেরিয়ে গেল পার্টি ছেড়ে। একটু পরেই গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ পাওয়া গেল। চলে গেছে তারা। যে অফিসার কাজটি করল, সে ফিরে এল হাত মুছতে মুছতে। গালি দিল— 'কুত্তার বাচ্চা!' অফিসার গালিটা উচ্চারণ করল এমন আকর্ষণীয় শান্ত কণ্ঠে যে মেয়েরা তার দিকে তাকিয়ে রইল প্রশংসা ও সমর্পণের দৃষ্টিতে— 'একটা পুরুষ! সত্যিকারের পুরুষ!'

'আপনি চেনেন ওই লোকটাকে?' গ্ল্যাডিস জিগ্যেস করল ন্‌আনখোকে।

সে গ্ল্যাডিসের কথার কোনো উত্তর দিল না। পার্টির অন্যদের উদ্দেশ্য করে বলল— 'লোকটা মাতাল হয়ে পড়েছিল।'

'তাতে কিছু এসে-যায় না।' অফিসার বলল— 'তাছাড়া মাতাল হলেই মানুষের মনের কথা বেরিয়ে আসে।'

'অর্থাৎ তুমি তাকে মেরেছ তার এই মনোভাবের জন্যই।' গৃহস্বামী বাহবা দিল— 'দারুণ জো!'

গ্ল্যাডিস আর তার পাশের মেয়েটি পরস্পরকে বলল— 'ওর নাম জো।'

ঠিক তখনই ন্‌আনখো এবং তার এক বন্ধু ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে, অভদ্রভাবে হলেও মাতাল লোকটি মেয়েদের সম্পর্কে যা বলেছে, তা দুঃখজনকভাবে হলেও সত্য। শুধু লোকটা কথাটা বলে ফেলেছে ভুল জায়গাতে। বাজনা ফের শুরু হলে ক্যাপ্টেন জো এগিয়ে এসে গ্ল্যাডিসকে তার সাথে নাচের আমন্ত্রণ জানাল। গ্ল্যাডিস পা বাড়াল সঙ্গে সঙ্গেই। এমনকি ক্যাপ্টেনের বাক্য শেষ হওয়ার আগেই। তারপরে তার মনে পড়ল ন্‌আনখোর অনুমতি নেওয়ার কথা। সে ফিরে তাকাল ন্‌আনখোর দিকে— 'এক্সকিউজ মি!'

'স্বচ্ছন্দে নাচুন।' বলল ন্‌আনখো। কিছু একটা খুঁজল দু'জনের মুখে।

নাচটা চলল অনেকক্ষণ ধরে। অন্যমনস্কতার ভান করে ন্‌আনখো নজরদারিতে রাখল দু'জনকে। একটা ত্রাণের বিমান উড়ে গেল। কিন্তু কেউ একজন বলল যে বিমান আক্রমণ হতে পারে। সে তৎক্ষণাৎ সুইচ টিপে নিভিয়ে ফেলল ঘরের সমস্ত আলো। কিন্তু এটা আসলে ছিল অন্ধকারে আরো ঘনিষ্ঠভাবে নাচার একটা বাহানা। এমনকি মেয়েরাও হাসল খিকখিক করে। কারণ ফাইটার প্লেনের শব্দ এখন সবাই চেনে।

গ্ল্যাডিস খুব আত্মসচেতনতার পরিচয় দিয়ে ফিরে এল ন্‌আনখোর কাছে। প্রস্তাব দিল তার সাথে নাচতে। কিন্তু সে রাজি নয়। 'আমাকে নিয়ে ভেবো না!' সে বলল— 'আমি নিজে নাচার বদলে বসে বসে নাচ দেখতেই বেশি পছন্দ করি।'

'তাহলে চলুন ফিরে যাই।' গ্ল্যাডিস বলল— 'আপনি যখন নাচবেনই না!'

'বিশ্বাস করো, আমি কখনোই নাচতে পছন্দ করি না। তুমি যাও। তোমার নিজের

মতো করে পার্টি এনজয় করো।'

এবার গ্ল্যাডিস নাচল লেফটেন্যান্ট কর্নেলের সাথে। তারপরে আবার একবার নাচল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে।

এই নাচটা শেষ হওয়ার পরে ন্‌আনখো ভাবল, এবার বাড়ি ফিরে যাওয়া যেতে পারে।

'দুঃখিত, আমি তোমার সাথে নাচতে রাজি হইনি!' ফেরার পথে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল ন্‌আনখো— 'আসলে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যুদ্ধ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত নাচে অংশ নেব না।'

গ্ল্যাডিস শুনল কথাগুলো। কিছু বলল না।

'যখন আমি ভাবি কেউ মারা গেছে... যেমন কাল রাতে পাইলটটি...। তাছাড়া এই যুদ্ধে তার কোনো হাত ছিল না। সে শুধু আমাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করার কাজে জড়িত ছিল... '

'আশা করি তার বন্ধু ওই লোকটির মতো নয়।' গ্ল্যাডিস বলল।

'লোকটা তার বন্ধুর মৃত্যুতে খুবই আপসেট ছিল। কিন্তু আমি বলছি সেইসব মানুষের কথা যারা মারা যাচ্ছে। এবং যখন আমাদের ছেলেরা সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে, সেই রকম সময়ে এই-জাতীয় পার্টি আয়োজন করার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাই না।'

'আপনিই তো আমাকে পার্টিতে নিয়ে গেলেন!' একটু ঝাঁঝের সাথে বলল গ্ল্যাডিস— 'ওরা আপনার বন্ধু। আমি তো কাউকেই চিনি না।'

'দেখো মাই ডিয়ার, আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। আমি শুধু বলতে চাইছি কেন আমি নাচে অংশ নেই না। যাহোক অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি। তুমি কি এখনো ঠিক করে রেখেছ যে কাল সকালেই ফিরে যাবে? আমার ড্রাইভার সোমবার খুব ভোরে তোমাকে তোমার অফিসে পৌঁছে দিতে পারবে। না? আচ্ছা, তুমি যা চাও তা-ই হবে!'

মেয়েটি এমন সহজভাবে তার সাথে বিছানায় গেল, আর এমন সব ভাষা ব্যবহার করল যে ন্‌আনখো একটু মর্মাহত না হয়ে পারল না।

'আপনি কি এখনই শুরু করতে চান?' প্রশ্ন করল গ্ল্যাডিস। এবং উত্তরের অপেক্ষা না-করেই বলল— 'শুরু করতে পারেন। কিন্তু দয়া করে আমার ভেতরে বীর্যপাত করবেন না।'

ন্‌আনখো নিজেও তা চায়নি। ফলে সবকিছু ঠিকঠাক মতোই ঘটল। কিন্তু মেয়েটা চাক্ষুষ প্রমাণ চাইল। তখন তাকে দেখাতেও হল।

যুদ্ধকালীন অর্থনীতি শিখিয়ে দিয়েছে যে একটা রবারের কনডম বার বার ব্যবহার করা যায়। আপনাকে এটা ধুতে হবে, ছায়ায় রেখেই শুকাতে হবে, তারপর প্রচুর ট্যালকম পাউডার মেশাতে হবে যাতে এটা সিঁটিয়ে না যায়। এটুকু কষ্ট করলেই জিনিসটা থাকবে একবারে নতুনের মতোই আবার ব্যবহারযোগ্য। আর এটা হচ্ছে একেবারে ইংরেজদের তৈরি একেবারে আসল কনডম। লিসবন থেকে আনা সস্তা জিনিস নয়।

তার আনন্দ হল ঠিকই। কিন্তু সঙ্গমশেষে মনে হল সে নিছক একটা বেশ্যার সাথে শুয়েছে। তার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল যে মেয়েটা কোনো-না-কোনো আর্মি অফিসারের রক্ষিতাগিরি করেছে। মাত্র দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কী ভয়ানক পরিবর্তন! তার পুরনো স্মৃতি যে সব মুছে যায়নি, সে যে নিজের নামটাও ভুলে যায়নি, এটাই বরং আশ্চর্যের। যদি ওই মাতাল রেডক্রস অফিসারের ঘটনাটি আবার ঘটে, ন্‌আনখো নিজেকে বলে, সে তাহলে নিঃসঙ্কোচে পার্টির মধ্যে ওই লোকটার পাশে দাঁড়াবে, এবং বলবে যে লোকটা সত্যি কথাই বলছে। একটা পুরো প্রজন্মের কী পরিণতি! এই জাতির আগামী দিনের মা এইসব মেয়েরাই!

সকালবেলা তার খারাপ-লাগা কমে এল। সে আরেকটু নমনীয়ভাবে চিন্তা করতে শুরু করল। গ্ল্যাডিস হচ্ছে এই সমাজের আয়না; যে সমাজ পচে গেছে, যার মস্তিষ্ক কীট-পতঙ্গের খাদ্য। আয়নাটা অবশ্য অক্ষত। তবে যথেষ্ট ময়লা জমেছে। কিন্তু আর নয়। এখন দরকার পরিষ্কার ডাস্টার। 'মেয়েটার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে' সে নিজেকে বলল— 'এই ছোট্ট মেয়েটা একসময় আমাকে আমাদের পরিস্থিতির কথা শুনিয়েছিল। এখন মেয়েটা ভীষণ বিপদে আছে; ভয়ংকর কোনো অপশক্তির কারণে।'

সে এই অপশক্তি নিয়ে গভীরভাবে ভাবল। শুধু অগাস্টা নামের বান্ধবীটাই নয়, এর পেছনে আছে নিশ্চয়ই কোনো ভয়ংকর পুরুষ, হয়তো সেই যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের মতো হৃদয়হীন কেউ একজন, যে বিদেশি টাকা পায়, যে যুবকদের স্মাগলিং করতে পাঠায় শত্রুদেশে; অথবা এমন কোনো ঠিকাদার যে ফ্রন্টে সৈনিকদের খাবার সরবরাহের জন্য টাকা নেয় কিন্তু খাবার পৌঁছে দেয় না; অথবা কোনো কাপুরুষ আর্মি অফিসার যে নিজের বীরত্বের বানানো গল্প ছড়িয়ে বেড়ায়। ন্‌আনখো সিদ্ধান্ত নেয়, সেই লোকটাকে খুঁজে বের করবেই। গতরাতে ভেবেছিল, মেয়েটিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য সে ড্রাইভারকে একাই পাঠাবে। কিন্তু না। সে নিজেই যাবে। নিজের চোখে দেখে আসবে মেয়েটা কোথায় বাস করে। ওখানে গেলে কিছু-না-কিছু সূত্র হয়তো পাওয়া যাবে। তার ওপর ভিত্তি করে সে হয়তো মেয়েটাকে উদ্ধারের পথে অনেকখানি অগ্রসর হতে পারবে। প্রতি মুহূর্তে তার মন মেয়েটির প্রতি নরম হয়ে পড়ছে। সে আগের দিন তার নিয়ে আসা রিলিফের জিনিসপত্র মেয়েটিকে দিয়ে দিল। একটা মেয়ের পক্ষে এসব জিনিস জোগাড় করা

খুব কঠিন। এগুলো পাওয়ার জন্য হয়তো তাকে কারো না-কারো প্রলোভনের শিকারও হতে হয়। ন্‌আনখো সিদ্ধান্ত নিল, ডব্লিউসিসি-তে তার বন্ধুকে অনুরোধ করবে যাতে প্রতি সপ্তাহে মেয়েটিকে কিছু রেশন দেওয়া হয়।

জিনিসগুলো দেখে মেয়েটির চোখে পানি চলে এল। ন্‌আনখোর কাছে বেশি টাকা ছিল না। সব মিলিয়ে কুড়ি পাউন্ড। সে পুরো টাকাই তুলে দিল মেয়েটার হাতে। বলল— 'আমার বিদেশি টাকা নেই। আমি জানি এই ক'টা পাউন্ড দিয়ে বেশি কিছু হবে না, কিন্তু...'

মেয়েটি ছুটে এসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফোঁপাচ্ছে। ন্‌আনখো তার ঠোঁটে চুমু খেল, চুমু খেল চোখে, বিড়বিড় করে বলল তার পরিস্থিতির শিকার হওয়ার কথা। কিন্তু কথাগুলো যেন উড়ে গেল মেয়েটার মাথার উপর দিয়ে। উল্লসিত হয়ে ন্‌আনখো দেখল, মেয়েটা তার উইগ মাথায় না দিয়ে ব্যাগে ভরে নিয়েছে।

'আমি তোমাকে একটা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে চাই।' সে বলল।

'কী?'

'কাল রাতে বিছানাতে যেসব কথা বলেছ, ওই রকম ভাষায় আর কখনো কথা বলবে না।'

সে কান্না চোখে নিয়ে হাসল। 'আপনার পছন্দ হয়নি? সব মেয়েরা তো এভাবেই বলে।'

'বলুক। কিন্তু তুমি অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা। তুমি কি প্রতিজ্ঞা করবে?'

'ঠিক আছে।'

স্বাভাবিকভাবেই তাদের ঘর থেকে বেরুতে একটু দেরি হয়ে গেল। তারপর গাড়িতে উঠে দেখা গেল ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না। ড্রাইভার ইঞ্জিন ঘেঁটে জানাল যে ব্যাটারি দুর্বল হয়ে পড়েছে। ন্‌আনখো ভয় পেয়ে গেল। তার এক সপ্তাহের বেতন, অর্থাৎ চৌত্রিশ পাউন্ড দিয়ে দুইটি ব্যাটারি বদলানোর সময় মেকানিক আশ্বাস দিয়েছিল যে ব্যাটারি নিয়ে তাকে অন্তত আগামী ছয়মাস কোনো চিন্তা করতে হবে না। এই রকম সময়ে আড়াই শ পাউন্ড দিয়ে নতুন ব্যাটারি কেনার কথা চিন্তাতেই আনা সম্ভব নয়। সে ভাবল, ড্রাইভারের গাফিলতির জন্যই আজকে এই দশা।

'গতরাতের জন্যই এই অবস্থা হয়েছে।' ড্রাইভার জানাল।

'গতরাতে কী হয়েছে?' ন্‌আনখো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিগ্যেস করল।

'গতরাতে আমরা হেডলাইট জ্বালিয়েছিলাম।'

'তার মানে আমি আমার গাড়ির আলো জ্বালাতে পারব না!' ঝাঁঝের সাথে বলল ন্‌আনখো— 'যাও, ধাক্কা দেওয়ার জন্য কয়েকজন লোককে ডেকে নিয়ে এসো।'

সে গ্ল্যাডিসকে নিয়ে আবার বাড়িতে ঢুকল। ড্রাইভার গেল প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে চাকর-বাকরদের ডেকে আনতে।

আধাঘণ্টা ধরে সামনে-পেছনে ধাক্কাধাক্কি করা হল গাড়িটাকে। ধাক্কা দিতে দিতে সাহায্যকারীরা অনর্গল উপদেশ বর্ষণ করে চলল যাতে কখনোই গাড়ির হেডলাইট জ্বালানো না-হয়। কারণ তাহলে ব্যাটারি দুর্বল হবেই। অবশেষে ভকভকিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ইঞ্জিন খক খক করে স্টার্ট নিল।

তারা রওনা দিতে পারল সাড়ে আটটায়।
কয়েক মাইল পরে রাস্তার ধারে দাঁড়ানো একজন পঙ্গু সৈনিক লিফট চাওয়ার ইশারা করল।

'গাড়ি থামাও!' চেঁচিয়ে উঠল ন্‌আনখো।

ড্রাইভার ব্রেক চেপে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল মালিকের দিকে।

'তুমি দেখতে পাওনি পঙ্গু মানুষটা লিফট চাইছে? গাড়ি পিছিয়ে ওকে তুলে নাও!'

'দুঃখিত স্যার!' ড্রাইভার বলল— 'আমি বুঝতে পারিনি যে মালিক ওকে গাড়িতে তুলে নিতে চান।'

'না বুঝলে জিগ্যেস করে নেবে। এখন গাড়ি পিছিয়ে নাও।'

সৈনিকটি সদ্য-তরুণ। কিশোরই বলা চলে। হাঁটুর নিচ থেকে তার ডান পা কাটা। সে চিন্তাও করতে পারেনি যে গাড়িটা দাঁড়াবে। তাই প্রচণ্ড বিস্মিত। সে প্রথমে তার কাঠের ক্রাচটি ঢুকিয়ে দিল ড্রাইভারের হাতে। তারপরে অতিকষ্টে নিজে উঠে বসল গাড়িতে।

'অনেক ধন্যবাদ স্যার!' ঘাড় ফিরিয়ে বলল সে। হাঁফাচ্ছে। 'আমি খুবই কৃতজ্ঞ ম্যাডাম। ধন্যবাদ!'

'ধন্যবাদের কোনো প্রয়োজন নেই।' ন্‌আনখো বলল— 'তুমি কোথায় আহত হয়েছিলে?'

'আজুমিনিতে স্যার। জানুয়ারির দশ তারিখে।'

'দুঃখ কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাদের নিয়ে আমরা গর্বিত। আমি নিশ্চিত যে এই অরাজকতা দূর হলে তোমরা তোমাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও সম্মান ঠিকই পাবে।'

'ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনাই করি স্যার।'

পরের আধাঘণ্টা আর কোনো কথা হল না। গাড়িটা একটা ব্রিজের দিকে যাচ্ছে ঢালু পথ বেয়ে। হঠাৎ কেউ একজন চিৎকার করে উঠল, হয়তো ড্রাইভার, হয়তো সৈনিকটি, 'ওরা আসছে!'

ব্রেকের কর্কশ শব্দ উঠল। মাথার ওপর প্লেনের গর্জন। গাড়ি থামার আগেই দরজা খুলে সবাই ছুটল পাশের ঝোপ লক্ষ্য করে। গ্ল্যাডিস ছুটছিল ন্‌আনখোর আগে আগে। পেছনে গাড়ির ভেতর থেকে সৈনিকটির আর্তচিৎকার ভেসে এল— প্লিজ কেউ একজন এসে আমার দিকের দরজাটা খুলে দিন!'

ন্‌আনখো অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল গ্ল্যাডিস দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে পেছন থেকে ধাক্কা দিল গ্ল্যাডিসকে। বলল ঝোপের দিকে আরো জোরে ছুটতে। প্লেনের গর্জন ভেদ করে একটা তীক্ষ্ণ হুইসেলের শব্দ ভেসে এল, বিস্ফোরিত হল। মনে হল সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। সে একটা গাছ জাপটে ধরেছিল। গাছটা এমনভাবে কেঁপে উঠল যে মনে হল তাকে ধাক্কা দিয়ে ছুড়ে দিল ঝোপের মধ্যে। এবার আবার বেজে উঠল সেই ভয়ংকর তীক্ষ্ণ হইসেল। থামল যেন পৃথিবীটাকে পুরোপুরি ধ্বংস করার পর। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। আবার বেজে উঠল হুইসেল।
এবং ন্‌আনখো আর কিছু শুনতে পায়নি।

অনেকক্ষণ পরে মানুষের গলা এবং কান্না শুনে যে জেগে উঠল। গন্ধ পেল পোড়া মাটির। আর দেখল ধোঁয়া উঠছে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পৃথিবী থেকে। সে নিজেকে টেনে তুলল মাটি থেকে। এগিয়ে চলল কান্নার শব্দের দিকে। দূর থেকে দেখল ড্রাইভারের শরীর রক্তে মাখামাখি। সে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে মনিবের দিকে। ন্‌আনখো দেখতে পেল তার গাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে। আর দেখতে পেল গ্ল্যাডিস এবং সৈনিকটির দেহের অবশিষ্ট কিছু অংশ। ন্‌আনখোর গলা চিরে বেরিয়ে এল আর্তনাদ। এবং আবার সে আছড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

স্যান্ডি লেনে ভালোবাসা

সেম্‌বেনে আউজমেন

[জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯২৩ তারিখে সেনেগালের জিগিনকর গ্রামে। মৃত্যু ৮৪ বৎসর বয়সে রাজধানী ডাকারে ২০০৭ সালের ৯ জুন। শিক্ষা শুরু আরবি মাদ্রাসায়। তবে পরবর্তীতে ভর্তি হয়েছিলেন ফ্রেঞ্চ স্কুলে। লেখালেখি করেছেন ফরাসি ভাষায়। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৯। লেখালেখির পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন অনেকগুলো। লস এঞ্জেলস টাইমস-এর মতে, তিনি হচ্ছেন 'আফ্রিকার মহৎ লেখকদের অন্যতম, এবং আধুনিক আফ্রিকান চলচ্চিত্রের জনক']

রাস্তায় কোনো নামফলক নেই, কিন্তু প্রত্যেকেই জানে এটা স্যান্ডি লেন। বেশি দীর্ঘ নয়— লম্বায় খুব বেশি হলে দুইশো গজ। শুরু হয়েছে বিলাসবহুল বাড়ি 'মারিয়াম বা' থেকে, এসে মিশেছে মেইন রোডে, সেটা চলে গেছে জেলার মধ্য দিয়ে। নামকরণের অনেকগুলো কারণ আছে।

স্যান্ডি লেনের মাথায় গর্বিত ও কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে হলুদ-নীলে রাঙানো প্রাসাদোপম ভিলা 'মারিয়াম বা'। জরাজীর্ণ কুটিরসারির মধ্যে কেবল এই বাড়িটারই আছে রাজকীয় আভিজাত্য। ধূসর জানালার ফাঁক দিয়ে তিনটি ঘর দেখা যায়, মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ফটোগ্রাফে ঢাকা। কোনো কোনো ফটো কাচের ফ্রেমে বাঁধানো। মিটমিস বা সূর্যাস্তের প্রার্থনার পরে আলহাজ মার সচরাচর ব্যালকনিতে পায়চারি করতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তার পায়ের নিচে এলোমেলো ছাদ— কোনোটি সমতল, কোনোটি কৌণিক, কোনোটি শুধু খড়ে ছাওয়া কুটির। স্যান্ডি লেনের অধিবাসীদের মনে করা হয় তাদের 'ভিলা' নিয়ে খুবই গর্বিত, কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রত্যেকেই ঔপনিবেশিক যুগের এই সরকারি কর্মচারীর প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ পোষণ করে, কারণ সে কথায় কথায় খোলাখুলি তার দম্ভ প্রকাশ করে লোকজনের সামনে।

লেনে ঢুকতেই হাতের ডাইনে প্রথমেই পড়ে পুরোগনের কুটির, সামনের দিকে নিচু বালিতে শক্ত করে পোঁতা তিনটি খুঁটিতে ঠেস দেওয়া। নিচের তক্তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, জোড়া দেওয়া হয়েছে লোহার পাত দিয়ে। লাল রঙের বার্নিশটাও রোদে পুড়ে মলিন। তারপরে আছে সাধারণের জন্য কলঘর যা এখন পরিত্যক্ত। (জেলার লোকেরা বলাবলি করে যে, ১৯৫৮ সালের রেফারেন্ডামে আলহাজ মার ছাড়া সবাই 'না' ভোট দিয়েছিল। তাদের প্রতিবাদী চরিত্রের কারণে পানির জন্য তারা যে কোনো স্থানে চলে যেত।) এর পরে আছে ইয়ে হাদির প্রাঙ্গণ, বাঁশের বাখারি দিয়ে ঘেরা। তিনি স্যান্ডি লেনের স্থানীয় সদস্য হবার ইচ্ছায় পুরনো প্রবেশমুখ বন্ধ করে দিয়ে স্যান্ডি লেন যাতে মেইন রোডের সঙ্গে মিলতে পারে সেজন্য জায়গা ছেড়ে নতুন পথ করে দিয়েছিলেন। প্রাঙ্গণের গায়ে লাগানো নিয়াং কারখানা। নিয়াং পরিবার এখনো তাদের পৈতৃক কামারের পেশা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সূক্ষ্ম কাজের নাম-ডাক আছে। স্যান্ডি লেনের প্রসিদ্ধ হবার ক্ষেত্রে তাদের অবদানও যথেষ্ট। সারা শহরের মহিলারা তাদের কাছে আসে কাজ করিয়ে নিতে। বুড়ো নিয়াং বিশালদেহী, তার পশ্চাদ্দেশও বিশাল। হাসিমুখে, ভুরুহীন বড় বড় চোখ নিয়ে ওয়ার্কশপের বাইরে বসে থাকে। স্যান্ডি লেনের যে কোনো পথচারীকে সে সালাম দেয়, শুধু আলহাজ মারকে বাদে। তারপরে আছে সালিফের ছুতার কারখানা। সে খুব চটপটে, গাঢ় বর্ণের মানুষ, মুড থাকলে খুব আমুদে। তবে সে সার্বক্ষণিক গায়ক। সে কোনো কারণে নিশ্চুপ থাকলে স্যান্ডি লেনের অধিবাসীরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। সেকারণেই যখন সালিফের গান বন্ধ থাকে, বলা হয় 'স্যান্ডি লেনের মানুষের' দিনকাল এখন খুব খারাপ। সবশেষে বিশাল 'মারিয়াম বা' ভিলার ঠিক আগেই বড় চালাঘরে থাকে মেইজা-পরিবার। মেইজা খুবই ধর্মপ্রাণ মানুষ। তসবিহ ছাড়া তাকে কখনো খালি হাতে দেখা যায় না।

স্যান্ডি লেনে বামদিকের সারির প্রথমেই গ্রানি আইতার মাতৃকুলের বাড়ি। ইটের ভিতগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। বড় বড় ফোকর দিয়ে হাঁস-মুরগি অনায়াসে চলা-ফেরা করতে পারে। তিনটি কাঠের পিলারের মাথা পরিণত হয়েছে পাখিদের বাসভূমিতে। সন্ধ্যা হলেই বাবুইপাখিরা ঝাঁক বেঁধে আকাশে উড়তে থাকে, ডাকে 'ফ্যাচো-ফ্যাচো' করে। তাদের ডাকের জন্যই এই পাখির স্থানীয় নাম— ফ্যাচো। তাদের কালো বাসাগুলো দোল খায় অন্ধকারের মধ্যে। তারপরেই আসে মাফদো-র গুদামের কথা; সে কয়লার ব্যবসায়ী, তার বাড়ির সামনে থাকে ঘরের চালার সমান উঁচু কয়লার স্তূপ। এর পরেই ইয়ুথ ক্লাব। দরজায় চক দিয়ে লেখা 'ইউএনও প্যালেস'। কয়েকজন ছেলে সেখানে আড্ডা দেয়, ওদের বেশিরভাগই বেকার। তবে তারা জানে না কেন তাদের কর্মস্থল থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে। দরজা দিয়ে তাকালে দেখা যাবে ক্লাবঘরে পুরনো পত্রিকার স্তূপ, দেয়াল জুড়ে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক প্রতীক, এই এদেশের রাষ্ট্রনেতার বড় ফটোগ্রাফ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশের রাজনৈতিক নেতাদের ছবি। আলোচনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে যুবকরা তাদের রাজনৈতিক আবেগ ঢেলে দেয় চায়ের কাপে। সবশেষে, ভিলা 'মারিয়াম বা'র উল্টোদিকে একটি অসমাপ্ত দালান। অনেক আগে একজন পুলিশ দালানটি তৈরি করতে আরম্ভ করেছিল। এখনো সেখানে পাঁজা-পাঁজা ইট। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সেখানে লুকোচুরি খেলে।

এই ছিল স্যান্ডি লেনের বাইরের চেহারা, যাকে বলে বস্তুগত অবস্থা। এসব সাধারণ বাড়ি নিয়ে বেশি কিছু লেখার নেই। কিন্তু ওই লেনের অধিবাসীরা একটা বিশেষ সম্পদের অধিকারী ছিল, যা সর্বত্রই আলোচিত হত।

প্রতি সপ্তাহে এলাকার সব গৃহিণী একযোগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে লেন পরিষ্কার করত। ভোরবেলা তারা নিজ নিজ দরজা খুলে রাস্তায় দাঁড়াত একটু ঝুঁকে, হাতে ছোট ছোট ঝাড়ু; তাদের ভঙ্গি দেখে মনে হত দলীয় নৃত্য শুরু হতে যাচ্ছে। দুই লাইনে মেয়েরা এগিয়ে এসে মিলিত হত রাস্তার ঠিক মাঝখানে, মনে হত বাজনার তালে তালে, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতে চলে যেত মেইন রোডের দিকে। দূর থেকে দেখে মনে হত মৃদু এক মানবী-তরঙ্গ। তারপর গর্ত খুঁড়ে তারা পুঁতে ফেলত সমস্ত ময়লা-আবর্জনা। লেনটা তৈরি হয়েছিল মিহি বালু দিয়ে। ফলে পায়ের তলায় মচমচ শব্দ উঠত না। এই পরিচ্ছন্নতার কারণে অধিবাসীরা তাদের প্রতিবেশী লেনের মানুষদেরও অনুমতি দিত এই রাস্তায় ঢোলক-উৎসব উদযাপনের। বিশ্বাসীরা পালন করত তাদের পয়গম্বরের জন্মদিন এই লেনেই। এটা ছিল শহরের একমাত্র লেন যেখানে বাস করে বিচিত্র ধরনের মানুষ, অথচ গভীরভাবে তারা একতাবদ্ধ। কিন্তু একটি সাধারণ ঘটনার জন্য, যা এই সময়ে খুবই সাধারণ এবং অহরহ ঘটছে, এই রকম একটি ঘটনার জন্য এই সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল...। স্যান্ডি লেনের অধিবাসীরা কেউ কারো দুর্নাম ছড়াতে অভ্যস্ত নয়, কিন্তু— এবং এটাই হচ্ছে সমস্ত সমস্যার মূল— তারা একে অপরকে বিশ্বাস করত না।

আলহাজ মারের দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রথম কন্যার নাম কিন। তার সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল শহরময়। ক্লাবের ছেলেরা যেসব গান গাইত, সেগুলোর প্রধান বিষয় ছিল কিনের দেহ-সৌন্দর্যের বর্ণনা। যখন সে বাজার থেকে কেনাকাটা করে ফিরে আসত, তার ঈষৎ চ্যাপ্টা মাথাটি থাকত খোলা, তার চমৎকার সুগঠিত কাঁধ সামান্য হেলানো, বোরখার ওপরে বেরিয়ে থাকা তার ভেলভেটের মতো মসৃণ গ্রীবা, এবং তার সোজাসুজি হাঁটার ভঙ্গি দেখে পথচারীরা তার দিকে বার বার মুগ্ধ চোখে না তাকিয়ে পারত না। কেউ কেউ তাকে লক্ষ্য করে বাতাসে ছুঁড়ে দিত কিছু শব্দ, চেষ্টা করত উত্যক্ত করতে। আর কিন হেসে ফেলত তার ঝকঝকে দাঁত বের করে।

স্যান্ডি লেনে কিছুই গোপন থাকে না, কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে কেউ-ই কোনো কথা

বলত না। সবাই জানত, কিনের হৃদয় ইয়োরোর কাছে বাঁধা। কয়লা ব্যবসায়ীর ছেলে ইয়োরো ছিল লাজুক প্রকৃতির কিন্তু সে 'কোরা' বাজাত খুব ভালো। মাঝে মাঝে সে ক্লাবের আড্ডা থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যেত। 'মারিয়াম বা'র জানালার সামনে গিয়ে কোরা বাজানো শুরু করত। কিনের সঙ্গে মুখোমুখি হলে, কিংবা দুজনের চার চক্ষু একত্রে মিলিত হলে দুজনেরই রক্তের মধ্যে মধুর একটা স্রোত বয়ে যেত, মিষ্টি রক্তের স্রোত, স্রোতটি পায়ের আঙুল থেকে শিরা বেয়ে উঠে যেত উপরের দিকে, তারা অনুভব করত এক ধরনের উষ্ণতা; যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি উষ্ণ।

স্যান্ডি লেনের অধিবাসীরা ছিল সরল-সহজ। তারা এই জুটিকে পছন্দ করত। এই প্রেম তাদের নিজেদের বিগত প্রেমের কথা মনে করিয়ে দিত বলে ওদের জন্য একটু ষড়যন্ত্রমাখা আশীর্বাদ করত তারা। সোজাসুজি মনে করত যে, যদি একজন ছেলে ও একজন মেয়ের মধ্যে প্রেম হয়, তাহলে কোনোকিছুই সেই প্রেমকে রুখতে পারে না।

স্যান্ডি লেনের অধিবাসীরা কথা বলাবলিতেও তেমন পটু নয়, তারা বাক্যবাগীশ নয়, তবু তারা গোপনে, নিজেদের ধরনে একটা বিবাহ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পুরুষ বা মহিলা যে কেউ কিনের সঙ্গে দেখা হলেই জিগ্যেস করত— 'ইয়োরো কেমন আছে?'

আবার ইয়োরোকে জিগ্যেস করত— 'কিন কেমন আছে?'

দুপুরে বিরতির সময় এবং সন্ধ্যা ছয়টায় কাজ শেষ করেই ইয়োরো চলে যেত পোরোগনে-র দোকানে, যেখান থেকে ভিলাটাকে পরিষ্কার দেখা যায়। সে সবগুলো জানালায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বার বার। কিন জানে, এ সময় তার কাজ শেষ হবার কথা। যদি সে দাঁড়ায় জানালায় এসে! স্যান্ডি লেনের সবাই জেনে গেছে এই যুগল কী পদ্ধতিতে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা কোনোদিনই বেশি কথা বলত না। অবশেষে কচ্ছপ-কবুতর দুজন এই মূকভাষা পরিত্যাগ করল। রাত্রে, শেষ প্রার্থনার পরে প্রত্যেকেই ঘরের বাইরে এসে বসে এবং রাত যখন নক্ষত্রখচিত চাদর গায়ে জড়িয়ে নেয়, ইয়োরো তখন অন্ধকারে বসে কোরা বাজানো শুরু করে। ওই সময় কিন-ও তার বাবা-মায়ের সঙ্গে ভিলার বাইরে বসে থাকে। কোরা-র মাধ্যমেই যেন ইয়োরোর হৃদয়ের বার্তা পৌঁছে যায় কিনের কাছে।

স্যান্ডি লেন এমনিতেই সুপরিচিত। এই রাস্তার কথা লোকগীতিতেও স্থান পেয়েছে। আলহাজ মার নিজের ভিলাতে মাঝে মাঝেই আমন্ত্রণ জানাত লোককাহিনীর কথকদের। কিন ও ইয়োরোর নিঃশব্দ প্রেমের কথা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। কিন্তু তখনো দুজনের কেউই চোরাদৃষ্টি বা কটাক্ষ, কিংব কোরা-র সুরের গণ্ডির বাইরে পা বাড়াতে সাহসী হয়নি।

একদিন অধিবাসীরা দেখল দেশের প্রচণ্ড প্রভাবশালী লোকদের আগমন ঘটেছে স্যান্ডি লেনে। তাদের মধ্যে একাধিক মন্ত্রী; কয়েকজন সচিব এবং আরো কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তারা উঠলেন আলহাজ মারের ভিলায়। সারাদিন ধরে চলল অঢেল খানা-পিনা। এভাবে তারা কয়েকবার আসা-যাওয়া করলেন। প্রত্যেক সপ্তাহে ভিলার সামনে গর্ত খুঁড়ে বিশাল চুলা জ্বালানো হয়, আগুনে ঝলসে তৈরি করা হয় আস্ত ভেড়ার রোস্ট। স্যান্ডি লেনের মাথায় সবসময় দাঁড়িয়ে থাকে বড় অফিসারদের বিলাসবহুল গাড়িগুলো।

ক্লাবের সদস্যরা ইয়োরোর পক্ষে ছিল। তারা হতাশ হয়ে পড়ল। অন্য অধিবাসীরা যেহেতু অভিজ্ঞ, অপমানের জ্বালায় নিজেদের মধ্যে গজগজ করত। প্রত্যেকদিন দুপুরে এবং সন্ধ্যা ছয়টায় তাদের দৃষ্টি থাকে মাটির দিকে নিবদ্ধ; রাত্রে কোরা-র ঝঙ্কার শোনা যায় না। এক মাস পরে স্যান্ডি লেনে একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হল এবং ইয়োরো উধাও হয়ে গেল। তিন মাস পরে কিনকেও আর দেখা গেল না। (জনশ্রুতি আছে যে প্রেমিকযুগলের অন্তর্ধানের পরে দুইটি গাছ লাগানো হয়েছিল— একটা পুরুষ, একটা নারী) এরপরে স্যান্ডি লেন তার গৌরব হারাল। রাস্তায় ময়লার স্তূপ, গৃহিণীরা তাদের ময়লা ছুঁড়ে দেয় 'মারিয়াম বা' ভিলার সামনে। এই লোকগুলো আগে কখনো কসম পর্যন্ত কাটত না, তারা এখন হয়ে পড়ল কটু-বক্তব্যের আধার। যুবকরা ছড়িয়ে পড়ল এদিক-সেদিক। এখন আর এলাকায় ধর্মীয় উৎসব পালিত হয় না, ড্রামের শব্দও শোনা যায় না।

স্যান্ডি লেন পরিণত হল পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখময় স্থানে। এবং আমি ডাকার যাবার পথে ভাবলাম, সমস্ত শহর-না আবার একই অভিশাপে আক্রান্ত হয়!

হে পুত্র

গ্রাহাম সুইফট

[গ্রাহাম সুইফট বিশ্বখ্যাত 'পাঞ্চ' গোষ্ঠীর লেখক। গোষ্ঠীভুক্ত অন্য লেখকদের মতো তাঁর লেখাতেও ব্যঙ্গ কৌতুকের মাধ্যমে উঠে আসে গভীরতর সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক সত্তাসঙ্কট। গোষ্ঠীসতীর্থদের মতো তাঁর লেখাতেও থাকে চেখভীয় চমকময়তা। সত্তরের দশকে তাঁর সতীর্থরা তাঁকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'সবচেয়ে সম্ভাবনাময় কলমশিল্পী' হিসেবে। আজ তিনি পরিণত। বর্তমান সময়ে আটলান্টিকের এপার-ওপারের ইংরেজি বলয়ে অন্যতম প্রভাবশালী গদ্যশিল্পী হিসেবে বিবেচিত তিনি]

সত্যিসত্যিই সবকিছু বদলে যায়। আপনি যা জানেন বলে দাবি করেন আসলে তা জানেন না। একসময়ে যেটা ভালো বা মন্দ, আরেক সময়ে সেটা পুরোপুরি উল্টো। একদিন আমি আমার নিজ গর্ভধারিণী মায়ের তিন-তিনটি আঙুল কেটে নিয়েছিলাম। বিশ্বাস হচ্ছে এ কথা? ঘটনাটি এথেন্সের যুদ্ধের সময়কার। মা তখন একটা মৃতদেহ। খেতে না পেয়ে মৃত্যু। আর কী অবাক ব্যাপার দেখুন, আমরা যারা তখনো বেঁচে ছিলাম, মায়ের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হবার বদলে নিজেদের সর্বগ্রাসী শূন্য পেট নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলাম। মায়ের আঙুলে ছিল তিনটে বেশ ভারি ভারি আংটি। আংটির বিনিময়ে কিছু খাবার তো মিলবেই। কিন্তু মায়ের আঙুলের গাঁটগুলো ফুলে ঢোল হয়ে আছে। ক্ষিধেয় কাতর আমার কথা ছেড়েই দিলাম। আপনারা কেউ-ই সেই গাঁট গলিয়ে আংটি টেনে খুলতে পারতেন না। সুতরাং আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হল, যেহেতু আমি ছিলাম ভাই-বোনদের মধ্যে সবার বড়। আমি রুটি কাটার বড় ছুরিটা তুলে নিলাম এবং...

পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমি আমার মায়ের আঙুল কেটেছিলাম। এখন আমি রেস্তোরাঁয় সালাদ আর পেঁয়াজ টুকরো করি। সত্যিই পৃথিবীটা যে ভাবে চলছে আমার একটুও পছন্দ হয় না! পঁয়ত্রিশ বছর আগে জার্মানরা কোনো কারণ ছাড়াই

গ্রিকদের খুন করেছে, হাত-পা কেটে নিয়েছে, চোখ উপড়ে নিয়েছে। আর এখন প্রত্যেক গ্রীষ্মে হাজার হাজার জার্মান ভিড় জমায় গ্রিসে। দুধসাদা বাড়িগুলো আর গাধার পিঠে বেকুবের মতো হাস্যমুখর আরোহীদের ছবি তোলে এবং গ্রিসের রোদে ট্যান করে নেয় নিজেদের চামড়া। অ্যাডোনি আমাকে জার্মান টুরিস্ট আর তাদের ক্যামেরা নিয়ে পাগলামির গল্প শোনায়। তা নইলে আমি জানবই-বা কী করে? তিরিশ বছর আগে আমি গ্রিসের বাহিরে।

যদি আপনার দেশটা যুদ্ধে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, যুদ্ধে আপনার বাবা ও মা মারা যায়, আপনার ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যায়, তখন আপনি কী করবেন? নিশ্চয় তাই-ই করবেন যা একজন বুদ্ধিমান গ্রিক করে থাকে। আপনি একটা বউ খুঁজবেন, যে সত্যি আপনার অর্ধাঙ্গিনী হবে, তারপর সাগর পাড়ি দিয়ে চলে যাবেন ন্যূইর্কে রেস্তোরাঁ খোলার আশায়। তবে পাঁচ-দশ বছর পরে পকেটে কিছু ডলার জমলেই আপনার গ্রিসে ফিরে যাওয়া উচিত। নইলে বিশ বছর ধরে পিঁপড়ের ঠোঁট থেকে চিনির দানা কেড়ে কেড়ে জমিয়ে আপনার যখন একটা রেস্তোরাঁ খোলার টাকা জমবে, তখন দেখা যাবে রেস্তোরাঁর ব্যবসাতে মন্দা। সাথে সাথে আপনি এটাও খেয়াল করবেন যে আপনি আর নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছেন না। এমনকি যদি খুব চমৎকার সুযোগ পেয়ে যান, তবুও না।

শতকরা একশো ভাগ সত্যি যে, আমি তীরের ফলার মতো গ্রিক সূর্যালোকের জন্য হাহুতাশ করি। আমি আপাদমস্তক একজন খাঁটি গ্রিক। তাহলে আমি এই ক্যালডোনিয়ান রোডে কেন মরতে পড়ে আছি? আমার এখন স্টেডিও কিংবা আরমোর কোনো জমজমাট ক্যাফেতে বসে বসে চা খাওয়ার কথা। হায়রে কপাল! আপনি যে মাটির উপযোগী, আপনার শিকড় সেখানে পোঁতা নেই এবং আপনার কিছুই করার নেই।

আমি কি একাই শুধু গ্রিক? হাজার হাজার গ্রিক রয়েছে এখানে। জন্মেছিলাম স্মার্নাতে। আমার বয়স তখন মাত্র কয়েক মাস, বাবা-মা অনেকের মতো আমাকে নিয়ে উঠে বসল এক ফরাসি জাহাজে। কারণ, আরেক দঙ্গল কসাই, জার্মান নয়— তুর্কি, তখন বাড়িঘর পোড়াচ্ছিল গ্রিসজুড়ে আর কোনো গ্রিককে দেখামাত্র কল্লা কেটে নিচ্ছিল।

হ্যাঁ। এভাবেই অস্তিত্বের সংশয় নিয়েই আমরা জন্মেছি এবং দিব্যি বেঁচে-বর্তে আছি।

নিচে রান্নাঘরে আনা বকবক করছে। এমনভাবে সে অ্যাডোনির সঙ্গে কথা বলছে যেন কিছুই ঘটেনি; সবকিছু আগের মতোই আছে। হায়রে মেয়েমানুষ! দিব্যি আমাকে বলল— তুমি ক্লান্ত কোস্টা সোনা, যাও তো শুয়ে পড়! ধোয়ামোছার যেটুকু কাজ বাকি তা অ্যাডোনি আর আমার ওপর নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতে পার।

আমিও তৎক্ষণাৎ শোবার ঘরে চলে এলাম।

সত্যিই আমি ক্লান্ত। ক্লান্ত হওয়াটা আমার উচিতও। উফ যা একটা দিন গেছে! সাতসকালে অ্যাডোনিকে আনতে এয়ারপোর্টে ছুটতে হল। তার ওপর গত দুই হপ্তার বাড়তি খাটুনি। হঠাৎ অ্যাডোনির মাথায় খেয়াল চাপল তার ছুটি দরকার, দুই হপ্তার জন্য সে গ্রিসে যাবে। পঁয়ত্রিশ বছর পর কিনা তার দরকার হল ছুটির।

অ্যাডোনি। কে যে এমন নাম রেখেছে? ইংরেজদের কাছে বড় বিদঘুটে শোনায়। ওরাই সেটাকে 'অ্যাডোনিস' করে নিয়েছে। অ্যাডোনিস অ্যালেক্সাপোল। কোস্টা এবং আনার পুত্র। জন্ম এথেন্স, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ। পিতা-মাতার সাথে প্রবাসী। যেমন আমি আমার পিতা-মাতার সাথে চলে গিয়েছিলাম স্মার্না ছেড়ে নতুন জায়গায়। তার কেমন লাগল, যখন সে জানল, তার পিতা শুয়ে আছে পোল্যান্ডে এক গণকবরে আর মা তাকে পৃথিবীতে পৌঁছে দিয়েই মরে গেছে। আনার পরিবার তাকে পুষ্যি নিয়েছিল। আনারা থাকত আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে, ক্যাসেভি স্ট্রিটেই। আর তাদের ঢিলছোঁড়ার নাগালেই ছিল অ্যাডোনির সত্যিকারের পিতামাতা, মেলিয়ানো পরিবারের বাড়ি। আমি আনাকে বিয়ে করার সময় অ্যাডোনিকে নিজের সন্তানের মতোই গ্রহণ করেছিলাম। না করেই-বা উপায় কী? আনা শর্ত জুড়েছিল— যদি আমাকে চাও, তবে অ্যাডোনিকেও গ্রহণ করতে হবে। আমি ভেবেছিলাম, ক্ষতি কী? আনা অ্যাডোনিকে নিক। পরে আমার নিজের সন্তান তো হবেই। কিন্তু আনা আমাকে আসল কথাটা জানায়নি। সে সন্তান ধারণে অক্ষম।

পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একটা মানুষ জানলই না, যাদের সে বাবা-মা বলে ডাকে, তারা তা নয়। এ বড় লজ্জার কথা। কিন্তু তার চেয়ে বেশি লজ্জা তার, যে তাকে সেটা জানাবে। আমরা সবসময় বলতাম— অ্যাডোনি বড় হলেই সব খুলে বলব। কিন্তু মেঘে মেঘে বেলা একটু বেশিই হয়ে গেল। শেষে আমরা নিজেরা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে শুরু করলাম, সে আমাদেরই ছেলে, অন্য কেউ নয়।

পুষ্যি নেওয়া একটা অভিশাপ। ছেলের কাছে কিছুতেই সত্যিকারের বাবা-মা হয়ে ওঠা যায় না। সন্তান গড়ে উঠবে কীভাবে? আমাদের অ্যাডোনি স্কুলে ছিল গোবর-গণেশ, লাজুক ছিঁচকাঁদুনে। প্রতিবছর আমরা ভাবতাম, সে এবার নতুন কুঁড়ির মতো ফুটে উঠবে। আমরা দু'জনে বলাবলি করতাম, হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই সে মেয়েদের হৃদয় হরণ করতে ছুটবে, রাত করে বাড়ি ফিরবে, তারপর হঠাৎ একদিন উদ্ধত ভঙ্গিতে বলবে, এভাবে রেস্তোরাঁ চালিয়ে জীবন পাড়ি দেয়া অসম্ভব। তারপর ঘটাং করে আমাদের মুখের ওপর দরজা আটকে বেরিয়ে যাবে। আমি সত্যি সত্যি চাইতাম এমনটা ঘটুক। কারণ সত্যিকারের পুত্ররা পিতার সাথে এ ধরনের ব্যবহারই করে।

কিন্তু এ ধরনের কিছু ঘটল না। আমরা যখন রেস্তোরাঁর মালিক হলাম, তখন তার বয়স আঠারো। সেই বয়সেও সে ধার্মিকের মতো বিনয়ী ও সাদাসিধে। খসখস শব্দ তুলে ওয়েটারের জ্যাকেট গায়ে চড়ায়। ডলমেডস আর সোডসোকিকিয়া রাঁধতে শেখে। খুব সকালে উঠে বাজারে যায় মিষ্টি আর শাকসবজি কিনতে। কেউ তাকে দোকানির সাথে ইয়ার্কি করতে দেখেনি। এমনকি পারতপক্ষে সে কথাও বলে না কারো সাথে। দরকারি জিনিসটার দিকে আঙুল তুলে ইশারা করে। অন্য ওয়েটারদের মতো সে খাবার নিয়ে ছুটোছুটি করে না। পা টিপে টিপে হাঁটে। তার চেহারাটাও 'অ্যাডোনিস' নামের সাক্ষাৎ প্রতিবাদ। তার মুখটা বিবর্ণ, চটচটে। আমি আমার শাঁসালো খদ্দেরদের সাথে যখন পরিচয় করে দেই— 'এই হচ্ছে আমার পুত্র অ্যাডোনিস'— খেয়াল করি খদ্দেরদের মুখে চাপা হাসি খেলে যায়।

আমি মাঝে মাঝে মুখ ফুটে বলেই ফেলি, অ্যাডোনি, একটু-আধটু ফুর্তি করো বুঝলে, ফুর্তি! কিন্তু তার সসেজের মতো মুখখানাতে বিন্দুমাত্রও উজ্জ্বলতা আনতে ব্যর্থ হয় আমার কথা। আমার অবশ্য তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকা উচিত নয়। সে পরিশ্রম করে প্রচণ্ড, খাবার পরিবেশনে নিখুঁত, বিল বলার সময় ভুল হয় না, বোতল থেকে কর্ক খোলার সময় এমন সাবধানে খোলে যেন সে পাখির পালক তুলছে। গত কয়েক বছর ধরে আমি কাজের মধ্যেই ফুর্তি করা শিখেছি। সন্ধ্যা হলেই ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে রাখি, খদ্দেরদের সাথে রসিকতা করি। লোকজন বলাবলি করে, ওই কোস্টা একটা চিজ! এমনকি রাতে শোবার ঘরেও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে চোখ মারি। আমরা গ্রিকরা এরকমই। যদি বেঁচে থাকি, নিজের কাজ করতেই থাকব। শুকনো ফুলগুলো যেভাবে মরতে মরতেও পানি পেলে হেসে ওঠে।

আনা শোবার ঘরে উঠে আসছে। সিঁড়িতে মট মট শব্দ। আনা আমার চেয়েও ভারি। সে এখন ধপাস করে নিজেকে শুইয়ে দেবে। কিন্তু অ্যাডোনি এখন শোবে না। বন্ধ রেস্তোরাঁয় টেবিলে পা তুলে দিয়ে বসবে। আয়েশ করে সিগারেট ধরাবে আর পড়বে লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসা বই 'মানসিক শক্তির গোপন তত্ত্ব' কিংবা 'অতীত রহস্য'। পড়বে খুব ধীরে ধীরে কিন্তু নিয়ম মেনে। ছেলেটা ইস্কুলে ভোঁতা ছিল, কিন্তু এখন বেশ ভারি ভারি বই পড়ে।

আনা থপ থপ করে বেডরুমে ঢুকল। ঘুমের ভান করে আধবোঁজা চোখে আমি ওকে লক্ষ করছি। পা থেকে জুতো ছুড়ে ফেলে জামার চেন খুলল সে। পোশাকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর ওকে সদ্য উন্মোচিত মনুমেন্টের মতো দেখাচ্ছে। বিছানা ঝেড়ে আনা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিল। ঘুমানোর আগে এটা নৈমিত্তিক কাজ। কিন্তু আমি অ্যালার্ম বাজার আগেই চিরদিন আনাকে জাগতে এবং বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে দেখেছি। সে আসলে খুবই নিয়ম মেনে কাজটা করে, যেটা করা উচিত। তার বিশাল

শরীর যেন তৈরি হয়েছে রান্না আর বাসন-কোসন নিয়ে গলদঘর্ম হবার জন্যেই। সৌখিন মানুষরা স্কার্টেমোড়া অগ্নিশিখার মতো নারীদেহ চায়। কিন্তু ভাবুন দেখি, এমন কর্মঘোটকী না থাকলে কে পুরুষদের শূন্য থেকে ওপরের তলায় টেনে তুলবে?

আমি যে মটকা মেরে পড়ে আছি আনা তা বুঝে ফেলেছে। বিড়বিড় করে বলল, এটা কোনো ব্যাপার নয় কোস্টাকি! সত্যিই তো আমরা ওর কেউ নই।

আনার শরীর থেকে ভেসে আসছে গ্রিজ আর পাউডারের গন্ধ। ভাবতে অবাক লাগে তার শরীর আজ আমার ভেতরে কোনো অনুভূতিই জাগায় না। আর এমন মাংসের স্তূপ কীভাবেই-বা তা পারে! অথচ আমি যখন টগবগে আঠারোয়, তখন তাকে হাইমেটোর ঝোপভর্তি মাঠে টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম কী প্রচণ্ড আবেগে, আর আনা সেদিন— 'রাক্ষস! আস্ত রাক্ষস!' বলতে বলতে আমার হাত টেনে নিয়েছিল দুই উরুর মাঝখানে।

অ্যাডোনি কি মেয়েদের সম্বন্ধে ভাবে? আমি শপথ করে বলতে পারি সে কোনো মেয়েকে স্পর্শই করেনি। আমি তাকে বলতাম, তুমি বিকালে ছুটি নাও অ্যাডোনি। আনা আর আমি মিলে রেস্তোরাঁ ম্যানেজ করতে পারব। কিন্তু সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাবাব ঝলসানোতে ব্যস্ত থাকত।

সেই সময় আমরা ওয়েট্রেস আমদানি করলাম। এটা একটা চমৎকার আইডিয়া, যদি সামর্থ্য থাকে। সুন্দরী ওয়েট্রেস থাকলে রেস্তোরাঁয় ভিড় বাড়বেই। কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল অ্যাডোনিকে উৎসাহিত করা। আমি তো চরিত্রহীন বুড়ো ভাম। প্রথমে এল ক্যারল, তারপর ডিয়ানা, তারপর ক্রিস্টিন। আমার দৃষ্টিতে ক্রিস্টিনই সেরা। রাতে রেস্তোরাঁ বন্ধ করে আমি তাড়াতাড়ি আনাকে নিয়ে শুতে চলে যেতাম, ক্রিস্টিন আর অ্যাডোনিকে ধোয়া-মোছার ভার দিয়ে। শুয়ে শুয়ে একটা কান ঠিকই খাড়া রাখতাম আর মনে মনে বলতাম— সব ঠিক আছে অ্যাডোনি। সুযোগ নিতে দ্বিধা করো না। তোমার পুরুষ নামের সুবিচার করো। ক্রিস্টিনকে কি তোমার পছন্দ হয় না? সে কি তোমার রক্তে উষ্ণতা আনে না? ওকে ঘরে নিয়ে যাও! তোমার মা-বাবার কিরে, ওকে বিদ্ধ করো।

কিন্তু কখনো তেমন কিছু ঘটেনি। ব্যাপারটা আরো খারাপ দিকে মোড় নিল যখন আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে ক্রিস্টিনের নিতম্বে হাত বোলাতে শুরু করলাম। কখনো কখনো আমার আঙুল ক্রিস্টিনের ব্লাউজের ফাঁকেও ঢুকতে চাইত। কেউ অবশ্য ব্যাপারটা জানতে পারেনি। কারণ ক্রিস্টিন এ নিয়ে কোনো হৈ চৈ না করে স্রেফ নিঃশব্দে চাকরিটা ছেড়ে দিল।

অ্যাডোনির বয়স ত্রিশ পুরলো। আমি ওকে নিয়ে রীতিমতো লজ্জিত। আমার এই

পুত্র— সে আদৌ পুরুষই নয়। গ্রিকবৈশিষ্ট্য বিন্দুমাত্র ওর মধ্যে নেই। তারপর নিজেই হেসে ফেলতাম— আমার সন্তান!

তাকে নিয়ে লজ্জিত হবার কোন অধিকারই-বা আমার আছে? তবু তাকে ফুর্তির মধ্যে রাখতে বড় ইচ্ছা হয়। আমি নিজে ওই বয়সে পাইনি, যা পাওয়া উচিত। তার চেয়েও সত্যি হচ্ছে, আমি নিজের সন্তানের জন্যে অবচেতনে আকুল, এই কাঠের ঘোড়া দিয়ে আমার সন্তানতৃষ্ণা কিছুতেই মিটতে পারে না। কিন্তু হায়, আনা'র মাসিক ততদিনে চিরতরে বন্ধ। নিভে গেছে আমার জননশিখা। অসহায় আমি মাঝে মাঝেই কেঁদে ফেলতাম।

এবং তখনই আমি ভাবতে শুরু করলাম— এটা পাপের প্রতিফল। কেন আমরা অ্যাডোনিকে প্রথমেই সব কথা জানাইনি? নিজের পরিচয় জানলে সে নিশ্চয়ই স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠত। রক্ত নিয়ে জোচ্চুরি খুবই অন্যায়। আমার মনে হতে লাগল, সে বুঝি কোনো ষষ্ঠইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যাপারটা জেনে গেছে এবং আমাদের শাস্তি দিচ্ছে। হয়তো যে কোনো মুহূর্তে অ্যাডোনি বলবে— আনা! কোস্টা! তোমাদের আর মা-বাবা বলতে আমি বাধ্য নই। রাজি নই।

আমি সবসময় ভয়ে ভয়ে তাকে লক্ষ করতাম। হায়রে যৌনক্ষমতাহীন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ আমি! এই সময়ে অ্যাডোনি একটু-আধটু ছুটি নিতে শুরু করে। সন্ধ্যায় বাইরে যায়। অবশ্যই যাবে। সারাদিনই তুমি ইচ্ছামতো ছুটি নিতে পারো। বলে, আমি সন্দেহবাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমি অবশ্য কিছু বলি না, শুধু চিহ্ন খুঁজি। অ্যাডোনি কি এখন বেশি বেশি আফটার-সেভ ব্যবহার করে? চুল বার বার আঁচড়ায়? ঘরের দরজা আটকে কি নতুন নাচ প্রাকটিস করে? আমি মনে মনে পুলকিত হই আর ভাবি, একটু সময় যাক, ব্যাপারটা জমে উঠুক, তারপর ওকে ডেকে বলব— বলো দেখি অ্যাডোনাকি, ব্যাপারটা কী? না না ব্যস্ত হবার দরকার নেই। এই নাও, আগে ব্রান্ডি খাও এক গ্লাস, তারপর বলো শুনি নাইটিঙ্গেলটার নাম কী?

কিন্তু কোনো আফটার-সেভের গন্ধ আমার নাকে ঝাপটা মারে না। তার চোখে কোনো নতুন নক্ষত্রের আবেশও ঠিকরে পড়তে দেখি না। সে অবশ্য প্রায় সন্ধ্যাতেই বাইরে যায়, আর বেশ রাত করে বাড়ি ফেরে। তারপর মোটা মোটা বই খুলে বসে। বইগুলো সব এমন যে, গুলি মারলে মলাট থেকে আধাকেজি ধুলো উড়বে।

একদিন জিগ্যেস করলাম— রোজ তুমি কোথায় যাও অ্যাডোনিক?

'লাইব্রেরিতে বাবা।'

'কিন্তু তুমি তো বাড়িতে ফিরে আসো রাত এগারোটার পরে। এতক্ষণ তো লাইব্রেরি খোলা থাকে না।'

সে চোখ নামিয়ে নিল। মুচকি হেসে বললাম, লজ্জার কিছু নেই। তুমি আমাকে সব কিছু বলতে পারো।
'আমি নিও এলেনিকাতে যাই বাবা।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। নিও এলেনিকার কথা আমি শুনেছি। ওটা বুড়ো গ্রিকদের ক্লাব। বুড়োগুলো ওখানে বসে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ে আর নিজেদের অতীত সমৃদ্ধির মিথ্যে গালগপ্পো করে। সব বোগাস। ওদের দুই-তৃতীয়াংশ আবার আদৌ গ্রিক নয়। সাইপ্রাস থেকে আমদানি।

ওইসব বুড়ো ভামদের মধ্যে তুমি কী করতে যাও?
গল্প শুনতে বাবা। গ্রিক সম্বন্ধে, আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে।

এবার আমার মুখ নিচু করার পালা। ব্যাপারটা তাহলে এই। অ্যাডোনি গোয়ান্দার ভূমিকা নিয়েছে। তার চোখে শিকারির আলো? হয়তো নিও এলেনিকার ওই বুড়োদের মাঝে এমন কেউ আছে যে যুদ্ধের সময় নিয়া আয়োনিতে আমাদের পাড়াতেই থাকত। অ্যাডোনি কি সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে?

অজান্তেই আমার গলার তীক্ষ্ণতা এল— ওরা তোমাকে আষাঢ়ে গল্প ছাড়া কিছুই শোনাতে পারবে না।

তুমি রেগে যাচ্ছ কেন বাবা?
আমি রাগছি না। আর এত বাবা বাবা করবে না। আমাকে কোস্টা বলেই ডেকো।

তুমি এখন আর পিচ্চি নও।
সে কাঁধ বাঁকাল। হঠাৎ তার গোলগাল রোঁয়া ওঠা মুখটাকে একেবারে অচেনা দেখাচ্ছে। সে যেন আমারই সমবয়সী একজন মানুষ— স্বল্পপাল্লার যাত্রার সহযাত্রী। যারা হাত মিলিয়ে বিদায় নেয় এবং পরস্পরকে তৎক্ষণাৎ ভুলে যায়।

ঠিক আছে। তোমার যদি বুড়োদের সঙ্গই ভালো লাগে, এর চেয়ে ভালো আর কিছু করার নাই-ই থাকে তবে নিও এলেনিকাতেই যেয়ো। আমাকে আবার টেনো না কিন্তু।

এসব বসন্তকালের কথা।
এগুলো শুধু সময়ের ব্যাপার। সব ঠিক হয়ে যাবে— আমি নিজেকে প্রবোধ দিই। কিন্তু আমার ভেতর থেকে অপরাধবোধটা কিছুতেই দূর হচ্ছে না। যাদের কাছে অ্যাডোনিকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছি তাদেরকে কী বলব? আনা আমাকে সান্ত্বনা দেয়— দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কিচ্ছু হবে না। ওসব অনেক অতীতের ব্যাপার। এখন আর কোনো পরিবর্তন ঘটার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই।

এবং তার কয়েকদিন পরেই, জুলাই মাসে, অ্যাডোনি দুই হপ্তার ছুটি চাইল। আমি

চট করে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর চোখে কি অচেনা কোনো ছায়া? অবশ্যই অবশ্যই, ছুটি যখন চাইছ, অবশ্যই ছুটি নেবে। তা যাচ্ছ কোথায়?
যদিও উত্তরটা আমি নিজেই জানতাম।

প্লেনের টিকেট কাটা হল। স্যুটকেস আর হালকা জামাকাপড়ও কিনল সে। সবই অ্যাডোনির জমানো টাকায়। মেয়েদের পেছনে না উড়িয়ে এগুলো জমিয়েছে সে। তাকে কি বাধা দেয়া উচিত? উল্টো আমি গেলাম ওকে প্লেনে তুলে দিতে।

এটাই নিয়তি। এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সে যাচ্ছে রাজা ইডিপাসের মতো অভিশপ্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে। সে খুঁজতে বেরিয়েছে নিজের উৎসপুরুষকে।

আনার গলায় অফুরন্ত সান্ত্বনা— তুমি এমন মনমরা কেন কোস্টাকি? আমাদের ছোট্ট অ্যাডোনি ছুটি কাটাতে গেছে। এটা তো ভালো কথা। একটু রোদ পোয়ানো ওর দরকার।

অ্যালার্ম বাজল। আনা আগেই উঠেছে, পোশাকের ফাঁস আটকাচ্ছে। সারারাত একবিন্দু ঘুম হয়নি আমার। পেট খামচে ধরে নিজেকে বিছানা থেকে তুললাম। বাইরে বৃষ্টি। আনা মজুরদের মতো করে কাপড় গুটিয়ে নিল। এখানে প্রায় শরৎ। কিন্তু এথেন্সে রাত তাওয়ার মতোই গরম আর পেভমেন্ট থেকে গরম বিস্কুটের গন্ধ ছোটে।

ঠিক চারটায় আমি এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। বিচারের রায়ের জন্য অপেক্ষমান কয়েদির মতো আমার হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করছে। দেখতে পেলাম, কাস্টমস ব্যারিয়ার পেরিয়ে আসছে সে এবং তৎক্ষণাৎ-ই আমি বুঝে ফেললাম— তার হাঁটার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল— যা জানার তা জেনেছে। আমি নিজের কাছে আর ওকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিতে পারছি না। তবু আমি হাসিমুখে এগিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলাম, যেভাবে বাবাদের রাখা উচিত যখন সন্তান ফেরে বহুদূরের অন্য লোকালয় থেকে, সমুদ্রযাত্রা শেষে কিংবা যুদ্ধশেষে। কিন্তু আমি কিছুতেই ওর ভেজা ভেজা চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছিলাম না।

দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে অ্যাডোনিকি। সময়টা ভালো কেটেছে নিশ্চয়ই। ভেলিয়াগসোনি গিয়েছিলে? সানিওতে? বোটে চেপে ইদ্রায় যাওনি? আহ অ্যাডোনি সোনা, বলো দেখি এথেন্সের মেয়েরা কি আগের মতোই...
আমার স্যুটকেস...

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে ছুটল লাগেজ বেল্টের দিকে। গাড়িতে বসে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠোঁটদুটোকে সে পরস্পরের সাথে সেঁটে নিয়ে গাড়িতে উঠল। আচ্ছা, তুমি তাহলে নিয়া আয়োনার চারপাশ শুঁকে বেড়িয়েছ। ছুটি ছিল তোমার অজুহাত মাত্র। ঠিক আছে বলো। ঈশ্বরের দোহাই, ব্যাপারটা এখনই

খোলসা হোক। কিন্তু সে ওসব কিছু বলল না। সম্ভবত ওর মনও বিক্ষিপ্ত। তার বদলে সে এথেন্সের গল্প শুরু করল। সারা এথেন্স গিজগিজ করছে টুরিস্টে। ভোলিয়াগমোনি? হ্যাঁ, হামলে পড়েছে মানুষ সেখানে। বিচে একটু পরিষ্কার জায়গায় বসার জন্যেও টিকিট কাটতে হয়। ইদ্রা? ওটা তো জার্মানদের ভিড় আর তাদের ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দে মুখর।

তৎক্ষণাৎ আমি বুঝতে পারলাম, সেই ভাঙাচোরা কিন্তু অসম্ভব সুন্দর গ্রিস, যার কথা আমি জানতাম এবং আমার মাধ্যমে অ্যাডোনি জেনেছিল, সেই গ্রিস পাল্টে গেছে পুরোপুরি।

বাড়ি পৌঁছেই সে কাপড় পাল্টে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। এমনভাবে কাজে হাত লাগাল যেন সে এখান থেকে কোথাও যায়নি। আমি তার আক্রমণের অপেক্ষায় আছি। খাবার নিয়ে যাওয়ার সময় আমরা পরস্পরকে লক্ষ করছি আড়চোখে, আর আনা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বার বার উদ্বিগ্ন চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। কিন্তু দিন কেটে গেল অন্যদিনের মতোই। রাতে রেস্তোরাঁয় আমরা আয়েশ করে বসে কফি খেতে খেতে অ্যাডোনির গল্প শুনছিলাম। হঠাৎ করেই আনা বলতে শুরু করল। ওর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুখে যেন খৈ ফুটছে। যুদ্ধের আগের নিয়া আয়োনার কথা, পুরনো ঝুল বারান্দাঅলা বাড়িগুলো, ওদের ব্লকে যে প্রতিবেশীরা থাকত, ভ্যাসিল কিপোনা একচোখ-কানা ব্যাঙের পা ফেরি করা লোকটার কথা সে গড়গড় করে বলে চলল। আমি কড়া চোখে আনার দিকে চাইলাম। তার বোঝা উচিত, এসব কথা বিপজ্জনক। কিন্তু মনে হল সে বুঝে-শুনেই এগুলো বলছে।

মা, যদি কিছু মনে না করো আরেকটু কফি আনবে!

আনা উঠে দাঁড়াল। এবং আমি অনুভব করলাম— সময় হয়েছে।

অ্যাডোনি একটা সিগারেট ধরাল— আমি গ্রিসে গিয়েছিলাম কাসেভি স্ট্রিট খুঁজতে। যদিও সব বাড়িঘর নতুন, তবু ওটা আগের জায়গাতেই আছে। বিশ্বাস করতে পারো, আমি ভ্যাসিলি পরিবারের একজনকে খুঁজে বের করতে পেরেছিলাম? সে হল কিটোস ভ্যাসিলি। আমার চাইতে বয়সে সামান্য বড়। সে-ই আমাকে জানাল বুড়ো এলিয়াস সোবানিদিকে কোথায় পাওয়া যাবে। তুমি কি তার কথা মনে করতে পারো?

আমার যখন দশ-বারো বছর বয়স, তখনই লোকটার বয়স ছিল সত্তরের মতো। আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। যমের মুখে ছাই দিয়ে ব্যাটা দিব্যি বেঁচে আছে!

কফির কাপটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল অ্যাডোনি। ততক্ষণ ঘর জুড়ে রইল এক অস্বস্তিকর নীরবতা। হঠাৎ অ্যাডোনির বিবর্ণ চটচটে মুখটা পাথুরে হয়ে উঠল— তুমি কি জানো আমি তোমাকে এখন কী বলতে যাচ্ছি?

আমার ভিতরটা ভেঙেচুরে যাচ্ছে— হ্যাঁ হ্যাঁ জানি! বল! বলে ফেল! বল!
এলিয়াস সোবানিদি আমাকে বলেছে, আমার পদবি 'অ্যালেক্সিপোল' নয়— 'মেলিয়নো'। জন্মের সময় মা, আর যুদ্ধে বাবাকে হারিয়েছি আমি।

কথাটা সত্যি— আমার গলা দিয়ে কোলাব্যাঙের ডাক বেরুল— আমাকে ক্ষমা করো অ্যাডোনি!

কিন্তু সে আমার দিকে পাথুরে চোখে চেয়ে রইল। এমন দৃষ্টি সে কোথায় পেল! আঙুলে সিগারেট পুড়ছে। হঠাৎ আমার মনে হল, সামনে এমন এক প্রৌঢ় বসে আছে যার যৌবন কখনোই আসেনি। সিগারেট ফেলে দিয়ে সে টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে ঝুঁকে বসল। তারপর বরফশীতল গলায় বলল— এলিয়াস আমাকে আরো কথা বলেছে। তুমি তো জানো, এলিয়াস বুড়ো যা বলে তা সত্যি। তাই না? সে বলেছে, তোমার পদবিও অ্যালেক্সিপোল নয়, অ্যালেক্সিপোলরা তোমাদের প্রতিবেশী ছিল। ওরা ছিল তামাক ব্যবসায়ী। তোমাকে তারা তুলে এনেছিল রিফ্যুজি জাহাজ থেকে। তুর্কিরা শহর পোড়ানোর সময় তোমার মা-বাবাকেও খুন করেছিল।

ঘরে বাজ পড়ল। আমি তাকিয়ে রইলাম অ্যাডোনির দিকে, যেন ভূত দেখছি। আনা কফি হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে। আমার দিকে বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে। সে-ও যেন ভূত দেখছে।

আমরা প্রত্যেকেই ভূত। কিন্তু একই সময়ে আমি উপলব্ধি করলাম— তবু আমাদের জীবনের বোঝা টেনে নিয়ে যেতে হবে আমৃত্যু। ফ্যাঁসফেসে গলায় বলতে চাইলাম— এলিয়াস সোবানিদি চিরকাল একটা মিথ্যেবাদী বুঝলে...

সারাজীবন অপরাধবোধের ইঁদুর আমাকে কুরে কুরে খেয়েছে, কারণ আমি আমার মায়ের আঙুল কেটে নিয়েছিলাম। আর আজ আমি জানলাম, সেই মহিলা আমার মা ছিল না। আর তুর্কিরা যে মুণ্ডুগুলো নিয়ে স্মার্নায় ফুটবল খেলেছিল, সেগুলোর মধ্যে দুটো ছিল আমার বাবা-মায়ের। ওহ! পৃথিবীটা এত বিশ্রীভাবে চলছে!

আমি বাহিরে যাচ্ছি, আলোর সন্ধানে

ভ্যালদাস প্যাপেভিচ

[জন্ম ১৯৬২ সালে লিথুয়ানিয়ায়। লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক। ১৯৯২ সাল থেকে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন প্যারিসে। প্রথম উপন্যাস 'অটাম ইন প্রভিনস' প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। পেয়েছেন একাধিক সম্মানজনক পুরস্কার]

এই শহরটা আমাকে অসুস্থ করে তোলে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই শুধু দেখতে হবে বাতাস কিভাবে ঝেঁটিয়ে রাস্তায় জড়ো করছে ধুলোর মেঘ, সিগারেটের টুকরো আর সকালের ছেঁড়া খবরের কাগজ। দেখতে হবে কিভাবে বাসস্টপে লোকজন পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে, গাড়ি থেকে কিভাবে হুড়মুড়িয়ে নামছে যাত্রীরা, কিভাবে কাদাপানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে ফুটপাতের দোকানের অর্ধেক যদিও ভেতরে তখনো হয়তো ঘুমিয়ে আছে পত্রিকাবিক্রেতা মহিলা। ধীরে ধীরে সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়, আর এখানে তৈরি হয় নিষ্করুণ বিশৃঙ্খলা। অবশ্য তার কাছ থেকে আর কীই-বা আশা করা যায়— সেই মেয়েটি এখন ভাঙা সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে সামনে-পেছনে দোল খাচ্ছে। সোফাটি বাড়ির মালিকের জঞ্জালঘর থেকে তুলে আনা। আসলে আমাদের নিজস্ব বলতে কোনো জিনিসই নেই। মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে আছে টুথপেস্টের অর্ধেক খালি টিউব, ভাঙা কাপ, বাচ্চার একগাদা ন্যাপি, গতকালের পত্রিকা, ছেঁড়া মোজা। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দুজনের সম্পর্কও এই ছড়ানো জিনিসগুলোর মতোই।

'বাচ্চাটা কাঁদছে আবার। আচ্ছা এখন কাঁদার কী হল! সারাদিন কাঁদবে, সারারাতও। আমি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছি। আয়নার সামনে যেতেও আমার ভয় করে। ও ছোট্ট সোনা, আমার মিষ্টি বাদাম— কাঁদে না সোনা! কী চাও বলো!'

সে জানালার কাচের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাল, আর তখনই পরিপূর্ণরূপে দেখতে পেল বাতাস কিভাবে ঝেঁটিয়ে রাস্তায় জড়ো করছে ধুলোর মেঘ, সিগারেটের টুকরো আর সকালের ছেঁড়া খবরের কাগজ; দেখল কিভাবে বাসস্ট্যান্ডে লোকজন পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে; কিভাবে....বাতাস! অকস্মাৎ ঘরটাকে তার কাছে তীব্র শ্বাসরোধী মনে হয়। আমি বাতাস চাই, এখানে দমবন্ধ হয়ে যেতে পারে! সে বুঝতেই পারেনি কখন দুদিকে হাত ছুঁড়েছে, তার হাতের ধাক্কায় ছিটকিনি খুলে গেছে, হাট হয়ে গেছে পাল্লা আর ঘরে ঢুকেছে দমকা বাতাসের সঙ্গে পেট্রোলের পোড়া গন্ধ এবং শহরের কোলাহলের শব্দ।

'এখন তোমার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে? তুমি করছ-টা কী? তোমার কি মন বলে কিছু নেই? তুমি কি বাচ্চাটাকে শেষ করে ফেলতে চাও?

স্ত্রী লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দড়াম করে বন্ধ করে জানালার পাল্লা— 'মানসিক রোগী!' দোলনার উপর ঝুঁকে পড়ে— 'কাঁদে না! কাঁদে না সোনা!' বাচ্চাকে তুলে নিজের বুকে চেপে ধরে— 'তোমার বাবা একটা উন্মাদ, তোমার বাবা জানে না সে ঠিক কী চায়, কোনটা খারাপ আর কোনটা ভালো। অন্তত সে বাল্বটা ঠিকমতো ঝোলাতে পারত!'

সন্ধে গাঢ় হল খুব ধীরে ধীরে। সে সোফার তলা থেকে টেনে বের করল একটা প্লাইউডের তৈরি বাক্স— একটা ছেঁড়া ন্যাপি, একটা ঝুমঝুমি, একটা বেঁকে যাওয়া এলুমিনিয়ামের চামচ অথবা... স্বপ্নগুলো। ঠাস! বাল্বটা ফিউজ হয়ে গেল— আর কিচ্ছু বাকি নেই। ঠাস! এবং শুধুই অন্ধকার, এবং তোমার বাবা জানে না সে কী চায়। বাক্সের বাতিল জিনিসগুলোর মতো সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যায়; ছেঁড়া ন্যাপি এবং অবিনশ্বর ভালোবাসা, এলুমিনিয়ামের চামচ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। যাকগে, কিন্তু বাল্ব এখন কোথায়? সে শেষবারের মতো খুঁজল। কিছু একটা করার চেষ্টা করল। সে টেবিল ঠেলে তার উপর উঠে দাঁড়াল। মাথার উপর ঝুলছে তার। এখন তাকে শুধু বাল্বটা ঠিকমতো সকেটে লাগিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু কাচটা খুব পাতলা আর পিচ্ছিল, ভেতরে সুতার মতো তারটা খুব ভঙ্গুর। ঠাস! দুইটি পৃথিবী, দুইটি সুযোগ— থাকো অথবা যাও? সে মুঠো আলগা করল। দেখল কেমন করে হাতের তালু পার হয়ে বাল্বটা তার কবজি ছোঁয়— ঠাস! যাহ পড়ে গেল! ভেঙে গেল।

'তুমি ইচ্ছা করে ভাঙলে। ইচ্ছা করে! তুমি সবসময় ছুঁতা খোঁজো বাইরে যাওয়ার, যাতে এখানে তোমাকে না-থাকতে হয়। আমি কেন এই অন্ধকারে বাচ্চাকে নিয়ে একা থাকব? তুমি দেখতে পাবে, একদিন আমিও ঠিক চলে যাব। তোমরা মনে রেখো আমি ঠিক ছুটে বেরিয়ে যাব! আমার ছোট্ট বাচ্চু, আমার মিষ্টি বাদাম, বাছা আমি আর পারছি না রে!'

সে মেঝেতে নেমে টেবিলটাকে আগের জায়গায় ঠেলে নিয়ে গেল। স্ত্রী এমন ভাব করল যেন এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। সে নিখুঁতভাবে এই ভঙ্গিমা শিখেছে। কিন্তু তুমি কিছুই পরিবর্তন করতে পারবে না; দুটোর মধ্যে তোমাকে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হবে, কারণ, কোনোভাবেই তুমি একইসাথে দুই জায়গায় থাকতে পারো না। ঠাস! এবং বাস্তবতা এভাবে নিজেই সমাধানের পথ খুঁজে নেয়, এবং এখনো তাই-ই ঘটছে, এটাই পথ, এবং অন্য কোনো পথ নেই, অভিযোগের কোনো সুযোগ নেই— তুমি জানো, আমাকে এখন বাইরে যেতে হবে। সে জুতো এবং ওভারকোট পরল। তার স্ত্রী এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন সে একটা ঘেয়ো কুকুর।

'আমি বাইরে যাচ্ছি, একটা বাল্ব কিনতে।'

রাস্তায় করুণ শূন্যতা। পানি থেকে স্যাঁতসেঁতে ভাপ উঠছে। তার মুখে চাবুক হানল ঠাণ্ডা বাতাস। শুধু ঠাণ্ডা বললে কমই বলা হয়। সে বাঁধের উপর দিয়ে হেঁটে চলল। গত তিনদিন হল বাতাস বইছে জোরে। সচরাচর যেমন দেখায়, তারচেয়েও বেশি ধূসর মনে হচ্ছিল শহরটাকে যা ডুবে আছে ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে। সে ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছিল, লাথি মারছিল রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট নুড়িতে। তার বিশ্বাস হয় না যে কোনোকিছুর পরিবর্তন হবে— এককোণে স্তূপ করে রাখা ন্যাপি, ফিউজ হয়ে যাওয়া বাল্ব, একটা ধূসর দিন। রাস্তায় পড়ে থাকা একটা খালি বোতলকে সে লাথি মেরে পাঠিয়ে দিল পানির মধ্যে। ওটা ভেসে গেল স্রোতের সঙ্গে।

জুস কাউন্টারে বসে থাকা কুত্তিটা বোতল খুলতে খুলতে এমন নোংরা চোখে তাকাল, যেন আমি একটা নিষিদ্ধ পুস্তিকা চেয়েছি। জ্বলন্ত ফুটপাত, গ্রীষ্মকাল— এগুলো কি আদপেই ছিল? ঘটেছিল? বৃক্ষগুলো বাতাসে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তাদের বিজয়ী ডালপালা প্রায় মাটি ছুঁয়েছে, তার পোশাক ছিল সবুজ, সবুজের মধ্যে সাদা পলকা ফোঁটা। 'না, আমি পারব না, কাল না, পরশুও না, আমার পরীক্ষা আছে, স্টেট লাইব্রেরিতে পড়তে যেতে হবে, না, সত্যি পারব না। আমার নাম ইরিনা, ইরিনা, আচ্ছা ঠিক আছে রবিবারে হতে পারে, আমি এখনো নিশ্চিত নই, হয়তো রবিবারে।' মফস্বল থেকে আসা এক যুবকের রোমান্টিক প্রেমকাহিনী— গেন্ডিমিনাস ক্যাসল, সভেন্ট্রাজিস উপত্যকা, পুরনো শহর, থ্রি ক্রস পাহাড়। আমরা সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। সন্ধ্যায় নেরিস নদী, ঠাণ্ডা হয়ে আসা দুই তীর— ওই গ্রীষ্মটার কি সত্যিই অস্তিত্ব ছিল? ওই সন্ধ্যাগুলো কি সত্যিই এসেছিল? প্রত্যেকদিন ওর সঙ্গে দেখা হবার মুহূর্তে আমি নার্ভাস বোধ করতাম, সেই অনুভূতিটা কি সত্যি? আর সেই দীর্ঘ প্রত্যাশার অপেক্ষা? বুকের দুরু দুরু কম্পন?

রেলিঙে হেলান দিয়ে সে একদৃষ্টিতে স্রোতের দিকে তাকিয়ে রইল। এখানে এলে এক অদ্ভুত দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে হয়তো-বা সেই রহস্যময় ছোট্ট সময়টুকুর জন্য

যা দ্রুত অতীতে পরিণত হয়েছে। কুয়াশা-ঢাকা এই পানির দিকে তাকালেই তার সেই অতীতের কথা মনে পড়ে যায়।

জানি না কেন, ওই সময়গুলোতে তুমি ড্রিংকের প্রয়োজন বোধ করতে খুব— বড় বড় চুমুক দিতে তুমি, আমাকে গ্রীষ্মের কথা বলতে দাও, সন্ধেগুলোসহ যা আজ অতীত। আমাদের বিবর্ণ ভালোবাসার জন্য— রোমান্টিক সেই দিনগুলো চলে গেছে, শহরতলী থেকে হেঁটে আসার পরে আমি আর তোমাকে কান্নায় লাল চোখ নিয়ে জানালায় বসে থাকতে দেখি না— বুঝতে চেষ্টা করো, আমি সবসময় তোমাকে সঙ্গ দিতে পারি না, মাঝে মাঝে আমি একা হতে চাই, প্রত্যেকেই মাঝে মাঝে একা হতে চায়। তোমার আহত অহঙ্কার, অভিযোগ, কটাক্ষ করে বলে কথা, আর অজস্র ভর্ৎসনা— 'কী ধরনের জীবন এটা, একটা নরককুণ্ড, বর্ণনার অতীত জঘন্য, তুমি আমাকে কিসের মধ্যে এনে ফেলেছ, অপদার্থ কোথাকার! তুমি থাকো তোমার দিবাস্বপ্ন নিয়ে।' আমরা যা আমরা তাই-ই এবং সোফায় শুয়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝোলানো বাল্বটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি। সর্বোপরি ভালোবাসা তো ন্যাপির স্তূপ নয়, জঞ্জাল বোঝাই প্লাইউডের বাক্স নয়, নড়বড়ে সোফা নয়, বরং ভালোবাসা হচ্ছে নদীর গভীর তলদেশের মতো; বাকি সবকিছুকে নদীর পানি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ন্যাপিগুলোকে, অর্ধেক খালি টুথপেস্টের টিউবকে, ফিউজ হয়ে যাওয়া বাল্বকে, বাতিল জিনিসকে, সংশয়কে, বিশৃঙ্খলাকে। ভালোবাসায় ডুব দিয়ে প্রতিদিন তুমি চলে যাও গভীরতায়, শান্তির দিকে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার দিকে, তিক্তমধুর স্থায়িত্বের দিকে এবং যদি না... যদি না... তুমি এজন্য কাউকে দোষারোপ করতে পারো না, কারণ তার ফল হচ্ছে— তোমার দিদিমার শ্লেষ্মাভর্তি বুকের ফেটে যাওয়া কফের একটা বুদ্বুদের মতোই। প্রায়ই তুমি এমন কিছু করে ফেল যা অনিচ্ছাকৃত, সম্পূর্ণভাবে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, একটা অচেনা কারণ দ্বারা তাড়িত হয়ে, যে কাজের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন তুমি ভেঙে ফেল ঘরের সর্বশেষ বাল্বটি, যখন-তখন চিলেকোঠায় চলে যাও, কোনো কারণ ছাড়াই পুরনো শহরের ক্যাফেতে গিয়ে বসে থাকো।

পকেটের মধ্যে হাত ঘষতে ঘষতে সে এগিয়ে চলল। চারপাশের সবকিছুই চলছে নিয়মমাফিক; লোকজন কাজ শেষে বাড়ি ফিরছে, রাস্তায় ভিড়।

'একটা বাল্ব? নিশ্চয়ই, কোনো সমস্যা নেই।' গির্জা আর টাওয়ারের ঘড়ি বেজে উঠল, অন্ধকার আরো ঘন হয়ে আসছে। এটা বিশ্বাস করা হাস্যকর নয় কি যে এইরকম সরু রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে মসীহের এবং যে প্রশ্নগুলো তোমাকে উত্যক্ত করছে, সেগুলোর উত্তর তিনি তোমাকে জানাবেন?

সে কোটের পকেট হাতড়ে তিনটি কোপেক বের করল। কিনে নিল একটি সান্ধ্য সংস্করণ পত্রিকা। 'ফ্রাঙ্কোর পারিবারিক সম্পর্ক' 'কে এই চরমপন্থীকে উত্যক্ত

করছে' 'মানুষের নৈতিক অবদান'। হঠাৎ দমকা বাতাস হাত থেকে পত্রিকা ছিনিয়ে নেবার উপক্রম করে। সে পত্রিকাটিকে রোল করে বগলের নিচে রাখে। অকস্মাৎ কী যে হয়, তার স্মৃতি ঝলসে ওঠে, সে মনের চোখে পরিষ্কার দেখতে পায় ফ্যাকাসে মুখটা, লম্বা নখগুলোতে নেইলপালিশ ফুলের পাপড়ির মতো ফুটে আছে। ভিন্ন ভিন্ন দিন কিংবা অসংলগ্ন ঘটনার মতো ছবিগুলো এই সন্ধ্যায় ম্লান আলোতে তার মনে ভেসে ওঠে। যেন জীবন্ত! সে একমমুহূর্ত থামে, আবার পত্রিকা মেলে ধরে; 'কে চরমপন্থিদের উস্কানি দিচ্ছে', 'মানুষের নৈতিক অবস্থান'— অকস্মাৎ একটা আলোর বর্শা তার সচেতনতাকে বিদ্ধ করে— 'আমি নৈতিকতা নিয়ে লেখালেখি করি, আমি একজন সাংবাদিক, মনিকা, এটা সত্যি যে আমি ভবিষ্যতের সাংবাদিক, কিন্তু আমার সময় মাত্র দুই বছর, এটা কোনো সময়ই নয়, খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাবে, উড়ে যাবে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না এমন দ্রুতগতিতে, তুমি এইটুকু সময়ে অন্যদের থেকে বড়জোর একধাপ এগিয়ে যেতে পারবে।' পুরোটা সময় পা নাচাচ্ছিল, তার চোখ নিবদ্ধ ছিল পায়ের ওপর, পা দুলছে সামনে-পেছনে পেন্ডুলামের মতো, সে সিগারেটে জোরে টান দিল, তার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন মেকি গলায় বলল, 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, এই যে আমার ফোন নম্বর, যদি কখনো প্রয়োজন মনে করো, যদি কখনো...'

টেলিফোন বুথ— দুই কোপেকের মুদ্রা ধাতব স্লটে শব্দ তোলে; 'আমাদের দেখা হওয়া দরকার, হ্যাঁ, এখন, এক্ষুনি, ওই আগের ক্যাফেটাতে।'

সে ঠাণ্ডা ঘাম নিয়ে ফোন বুথ থেকে বেরিয়ে আসে— লম্বা সুন্দর আঙুলগুলো, একটু ফ্যাকাসে মুখ, একটু অবাক হওয়া মিষ্টি কণ্ঠ। এতে ভালোটা কী হবে— প্রতিশোধ, অথবা হয়তো নিঃসঙ্গতার বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ, যা হোক, উষ্ণ ক্যাফেতে একাকী বসে পুরনো বস্তাপচা গানগুলো শোনা কোনো কাজের কথা নয়, বিশেষত এরা সবসময় পুরনো রেকর্ডগুলোই বাজায়, মুখটি একেবারে নতুন না হলেও ধূসর দিনগুলোতে সবসময় চোখের সামনে থাকা মুখটির চেয়ে তো নতুন। নতুন একটা ঘটনার প্রত্যাশায় সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। নিজের অজান্তেই বেড়ে গেল হাঁটার গতি। ক্যাসল ক্রস স্ট্রিট। দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে— ডাডা। অবচেতনের চোরাস্রোত যে মানুষকে কোথায় নিয়ে যাবে কেউ তা আন্দাজ করতে পারে না। ভেতরের জীবনকে চিহ্নিত করা যায় বিশৃঙ্খলা আর অসংলগ্নতার প্রতীক দিয়ে। অসংলগ্নতা ও বিশৃঙ্খলা— এই হচ্ছে স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতা মানেই হচ্ছে বিশৃঙ্খলা আর অসংলগ্নতা। ইরিনা নিশ্চয়ই এ কথায় একমত হবে না, কান্না আর হিস্টেরিয়া... একটা রেখা আমাদের পৃথক করে রেখেছে। আমাদের কারোরই সেই নিষেধ-রেখা পেরুনোর সামর্থ্য নেই। সে একটা নুড়িতে লাথি মারল, তারপর চলতে থাকল আগের মতোই। স্টিরিওটাইপ চিন্তা, আগে থেকে

ছক তৈরি করে রাখা জীবন; প্রত্যেক যুবক-যুবতীকে তাদের জীবনের পাঁচটি বছর সঁপে দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে (টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে) তারপর জুটবে একটা ডিপ্লোমা, একটা উষ্ণ বিন্দু, ওপরে উঠার সিঁড়ি, ছোট্ট ছিমছাম একজন শিল্পী কিংবা পাগল, 'তোমার বাবা একটা পাগল, তোমার বাবা জানে না সে নিজেই কী চায়।' প্রথম প্রথম ছিল অসম্ভব ভালোবাসা, বিস্ময় ও খুশিতে মাখা, যেন এইভাবেই জীবন চলতে পারে— কী রহস্যপূর্ণ ঘর, কী আশ্চর্য সোফা, গ্রীষ্মের অ্যাডভেঞ্চারের মতো নেমে আসে রোমান্টিক প্রেম! 'এখন এখানে শুধু অতীতের গল্প, এ যেন বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পোস্টকার্ড, আমরা এখানে সুখী হব', কিন্তু তখনো দেয়ালে কথাটা লেখা ছিল, অবশ্যম্ভাবীরূপে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে... কারণ তুমি চাইতে একটি সবল হাত, যে হাত তোমার চোখের মধ্যে তীব্রগতিতে ঘূর্ণায়মান বিশৃঙ্খলা বন্ধ করে দিতে পারবে, আর সবকিছুকে সাদা-কালোয় চিহ্নিত করে দিতে পারবে; এটা ভালো, ওটা খারাপ; কারণ তুমি চাইতে আলোর জন্য এমন একটি বাল্ব যা কখনো ফিউজ হবে না, কারণ তুমি চাইতে মাথার উপরে একটি ছাদ এবং তোমার নিজস্ব কিছু জিনিস— তোমার নিজস্ব; এটি একটি কৌতুক, ওই যে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলা ক্লান্ত লোকগুলোকে দেখ, ওরা পৃথিবীকে পাবার জন্য নিজের সর্বশেষ শক্তিবিন্দুকেও কাজে লাগাচ্ছে। এটা বোকামি, অবশ্যই এটা চিন্তারও অযোগ্য যে এই সময়ে তুমি শুধু কয়েকজন বুড়োর মাথায় টোকা দিতে চাও অথবা জোরে শিস বাজাতে বাজাতে হেঁটে যাও ক্যাসল ক্রস স্ট্রিটে।

অবশেষে নির্ধারিত ক্যাফে। কাঠের দরজার মাথায় বসানো চৌকা জানালা দিয়ে সে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল, যেন এইমাত্র সে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হয়েছে। সে ভেতরে ঢুকল।

'একশো গ্রাম ভদকা, রাশিয়ান ভদকা, আর কফি।' বারটেন্ডার ফ্যাকাশে চোখ মেলে ঘরের সব কোণের দিকে চাইল তারপর বোতল খুলে গ্লাসে ঢালল ভদকা। নির্দেশমতো পরিমাণে। একফোঁটাও বেশি নয়। একঘেয়েমি; ম্লান আলো আর একঘেয়েমি উঠে আসছে আধা-সমাপ্ত কফির ধোঁয়ার সঙ্গে, শূন্য মদের গ্লাস থেকে, নিচু গলায় বলা শব্দগুলো থেকে। তার জন্য মেপে দেয়া পানীয় গলায় ঢেলে কফির কাপ হাতে তুলে নেবার সময় সে দেখতে পেল একটা ফাঁকা সিট, করিডোর থেকে বেশ দূরে। পকেট থেকে সিগারেট বের করল একটা। এখানে সিগারেট খেতে দেওয়া হয়, এটা অন্তত ভালো। আলোতে দেখা গেল পাশের সিটের মেয়ের হলুদ চেহারা, যেন শতবর্ষের যক্ষ্মায় আক্রান্ত। ওদের ছেঁড়াখোড়া ট্রাজিক চেহারাগুলো দুঃখজনকভাবে মলিন হয়ে যাচ্ছে। মনিকাও অনেকটা ওদেরই মতো— অন্তত ওর লম্বাটে মুখ আর মাছের চোখের মতো চোখ। 'আমি নৈতিকতা নিয়ে লেখালেখি করি,' এক পা আরেক পায়ের উপর তোলা, দোল খাচ্ছে সামনে-পেছনে সামনে-পেছনে। ছিটকে আসা আলো, দেয়ালে ছায়ার নাচানাচি, মৃদুশব্দের হাসি, বলে

বোঝানো যাবে না, নিজের চারপাশে প্রতিমুহূর্তে কী পরিমাণ বিদ্রূপাত্মক ঘটনা ঘটছে। কেউ বুঝতে পারবে না যে ওইসব হলুদাভ মুখ, ঠেলে ওঠা গালের হাড়, ক্লান্ত চোখগুলোর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক ঠিক কী রকম। নিচের, মেকি বাস্তবতার মুখোশ চুরচুর হয়ে যায়, দিনাতিপাতের বোঝায় রোমান্টিক স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়।

সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে সে বুকভর্তি ধোঁয়া টেনে নিল। অনুভব করল মলিন আলো তাকে কিভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। শয়তান এটা নেয়, তুমি নিজের সঙ্গে এমনভাবে কথা বল যেন কথা বলছ সম্পূর্ণ অচেনা কারো সঙ্গে, যেন তুমি দুই ভাগে বিভক্ত, এক অংশ এখানে বাকি অর্ধেক ওখানে— অন্যপাশে কোথাও, কুয়াশার মধ্যে, ধোঁয়ার মধ্যে, আচ্ছন্নতার মধ্যে, এতই দূরে যেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়, অবচেতনের নদীতে ডুবে আছে, সবকিছুই এই পথে চলে যায়; খুব সুচারুভাবে স্থাপন করা মোজাইক, ঠাস-বাঁধানো পাথরের উপর ফেটে যাওয়া সহস্র খণ্ডের কাচ, গাদা করে রাখা ন্যাপি, একটা ছেঁড়া মোজা, দুর্ভাগ্যক্রমে, অপ্রয়োজনীয় জিনিসে বোঝাই একটা প্লাইউডের বাক্স। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে এ ব্যাপারে চিন্তা না করা, পুরোপুরি ভুলে যাওয়া, তা কি দরকারি?— মনিকা বোধ হয় শিগগিরই এসে পড়বে। 'আমি একজন সাংবাদিক', ধূসর চোখ আর লম্বা লম্বা চোখের পাপড়ি; 'আমরা অবশ্যই একত্রিত হব', বেশ এবং তুমি তাকে কী বলতে পার, খুব সাজানো-গোছানো এবং বানানো বিবৃতি এবং এক পা আরেক পায়ের উপর তুলে দেওয়া, সামনে-পেছনে-সামনে— পেন্ডুলামের মতো। হঠাৎ-ই সে কেঁপে উঠল, মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল হিমস্রোত। ইরিনা এখানে কী করছে? ইরিনা, ঝুঁকে আছে দোলনার উপর, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাচ্চার দিকে, বুকে তুলে নিচ্ছে বাচ্চাকে, অন্তঃসত্ত্বা হবার আগে সে অনেক বেশি সুন্দরী ছিল; 'আমার ছোট্টবাবু, আমার মিষ্টি বাদাম', উপরে ও নিচে, ঘুমাও, ঘুমিয়ে পড়, বাচ্চা— সে দোলাচ্ছে উপরে-নিচে, সামনে-পেছনে।

কফির কাপটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং সে খুব অস্বস্তির সাথে চেয়ার সরিয়ে নিল। অবাক তাকিয়ে আছে হলুদাভ মুখগুলো; তখন দরজায়— 'তুমি কোথায়?... শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকলে!'
'আমি দুঃখিত, আমি সত্যিই...'

সে নিজেকে আবিষ্কার করল একটি পরিত্যক্ত পার্কে। বেঞ্চিটা ভেজা— গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। বোকা, বোকা, বোকা। শুধু বুড়ো আর ভবঘুরেরাই এখানে আসে— উল্টোদিকে বসে এক বুড়ি তার ব্যাগ থেকে রুটির টুকরো বের করে জাবর কাটছে, কিছুটা ছড়াচ্ছে। তার জুতোর পাশে কবুতরের ওড়াওড়ি। বোকা। সামনে-পেছনে, ওপরে-নিচে। অপরিষ্কার জুতো থেকে প্রস্রাবের দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। আমাকে যেতে হবে। আমার একটা বাল্ব খোঁজা দরকার। এখন, রীতিমতো অন্ধকার, টিপটিপ

করে বৃষ্টি পড়ছে, সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই এবং জনশূন্য। বাল্ব পেতে হলে তোমাকে ইলেকট্রিকের খাম্বা বেয়ে উঠে খুলে আনতে হবে, অথবা... সে থেমে আবার পেছনে তাকাল; একটি বাল্বের মতো নীল আলো ঝরছে আকাশ থেকে, সেগুলো মাটিতে পড়ছে খুব ধীর গতিতে। এটা বৃষ্টি হতে পারে না। এটা একটা রসিকতা, অবশ্যই, বাল্ব, নষ্ট প্রত্যাশা। সে কলার উঁচু করে দুই হাত কোটের পকেটে ঢুকিয়ে হেঁটে চলল, চেষ্টা করছে কোনো কিছু নিয়ে না-ভাবতে; চেষ্টা করল ভাবনাচিন্তাগুলোকে দূর করে চিন্তাশূন্য হতে।

শূন্য শহরের মধ্য দিয়ে সে হেঁটে চলল। শহরটাকে আরো সংকুচিত, আরো নির্জন মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পর সে একটা নুড়িতে লাথি মারছে, কিছুক্ষণ পর পর থেমে দাঁড়াচ্ছে কোনো স্যুভেনিরের দোকানের সামনে, জানালায় উঁকি দিচ্ছে, মনে হচ্ছে ভেতরে রয়েছে উষ্ণতা ও আরাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেলল সেন্ট জনস ক্যাথেড্রালের মূর্তিটি অন্ধকারে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, পাশে ঘণ্টার টাওয়ার আর বিশাল চত্বর। একসময় আমি এখানে লেখাপড়া করেছি; লেকচার, সেমিনার, অধ্যাপকবৃন্দ, সবকিছু এখন কুয়াশার মধ্যে, চত্বরের ভেতর দিয়ে রাস্তাটি পেছনে চলে গেছে এবং ইরিনা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে— আর কেউ নয়, ইরিনা— 'আমি বলেছিলাম, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে এভাবেই এটা বেরিয়ে আসবে; ব্যায়ামের ক্লাস, তুমি একটা অকর্মার ধাড়ি, তুমি সারাদিন সোফায় শুয়ে-বসে কাটিয়ে দাও।' কিছুই না-করে সবকিছুতে নাটকীয়তা আনা, অথচ সবকিছু সত্যিসত্যিই অনেক সরল, একটা এ্যালুমিনিয়ামের চামচ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। জানালার চারপাশে একটা মাছি হাঁটছিল ঘুরে ঘুরে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ঠিক সেখানেই পাওয়া গেল, ঠাস! সেখানে, নিষ্পেষিত এবং তার বেশি কিছু নয়, শুধু নিষ্পেষিত, বিশ্বের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করা হোক। বিশ্বের প্রেক্ষিতে চিন্তা করা হোক— অ্যাসপিরিন, যা পানির সঙ্গে গিলে ফেলা হয়, সব ধরনের ট্যাবলেটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, দুর্ভাগ্যক্রমে, যদিও পরস্পরবিরোধী বাস্তবতার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ নেই। ক্যাফেটাতে কী ঘটেছিল? নিছক বোকামি। এক পা আরেক পায়ের উপর তোলা, ঘুমাতে যাও, ঘুমিয়ে পড়, বাচ্চা, সর্বোপরি তুমি তো বিশ্বাসযোগ্যতার ভান করেছিলে, পুরনো শহরের অগোছালো চত্বরে লাফ দেবার রশি। কে তোমাকে রেখাটি পেরুতে বাধা দিচ্ছে, কে তোমাকে জোরে শিস বাজিয়ে হাতের ওপর ভর দিয়ে পুরনো শহরের প্রধান রাস্তায় হাঁটতে বাধা দিচ্ছে এবং কেন নয়, একদিন তাকে এবং নিজেকে বলো যে অনেক আগে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, ওটা উড়ে গেছে, ভেঙে গেছে, ভেসে গেছে, ছিটকে পড়েছে, অতীত হয়ে গেছে বাতাসের সঙ্গে এবং রাস্তার পাশের ময়লার সঙ্গে। বাচ্চাটা ছিল আমাদের সর্বশেষ আশা, আমরা দুজনেই উত্তেজিত, এই একটা জিনিসই আমাদের দুজনকে একত্রে রেখেছে— পরে তা হাজার টুকরো হয়ে যাবে— একসঙ্গে গাঁথা, একের সঙ্গে

আরেকজন, এমন এক ট্যাপেস্ট্রি যার পুনরাবৃত্তি নেই, দুই বছরের অসাধারণ ঐক্যতান, একটা কৌতুক, শিশুসুলভ স্বপ্ন, একটা লাল পোকা বালিশের উপর চ্যাঁচাচ্ছে, নির্ঘুম রাতগুলো, ইরিনার জগৎ শুরু এবং শেষ তাকে নিয়ে। এ যেন একটা খেলা। তুমি ওইপাশে এবং আমি এখানে এবং আমাদের মাঝখানে এই শিশুটি— যার কিছু অংশ তোমার এবং কিছু আমার, এবং সবকিছু খুবই হাস্য-কৌতুকের; তুমি তোমার হাত আমার দিকে প্রসারিত কর; আমি নিজেকে তোমার দিকে প্রসারিত করি, কিন্তু তারা পরস্পরকে কখনো স্পর্শ করে না, তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও, আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই, কিন্তু কখনোই আমাদের কথোপকথন হয় না, তুমি চাও সব কিছু ঠিক থাকুক, আমি চাই ঠিক থাকুক, কিন্তু সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়, তুমি এ নিয়ে কাঁদতে পার কিংবা কাঁদাতে, এটাই হল সেই— কালো নাটক।

সে থেমে দাঁড়াল শহরের অন্ধকার, নিষ্প্রদীপ অংশে। বাড়িগুলো পরস্পরের দিকে হেলে আছে, প্রায় ছুঁয়ে আছে পরস্পরকে, রাস্তার দুইপাশেই, মাঝখানে শুধু একটা সরু গলি। বৃষ্টির বেগ আরো বেড়েছে। বৃষ্টির লম্বা জলরেখা দেয়ালের উপর মাকড়সার সুতার মতো— ওরা ছুটছে, কাঁপছে, একত্রে ছুটছে শুধু পৃথক হবার জন্যই, তারপর আবার প্রসারিত হচ্ছে, যতক্ষণ-না একটা বড় ধারায় বিলীন হয়ে উপর থেকে নিচে পড়ছে। বৃষ্টি হচ্ছিল।

অর্থাৎ— একটি কালো নাটক। সে ওভারকোটের বোতাম খুলে বৃষ্টির দিকে ঘুরল এবং হেঁটে চলল। একটা প্রাণীও বাইরে নেই; সে ভেজা সিগারেটগুলো ছুঁড়ে ফেলল নালায়। তুমি এখন কী করতে পারো? এখানে বসে কাঁদো, এখানে বসে হাসো। বাল্ব— আলো। ফিয়াট লাক্স! প্রয়োজন মনে হলে, এখন অন্ধকারে, তুমি কারো চোখ উপড়ে আনতে পার। সে হঠাৎ থমকে গেল, একটা টেলিফোনের খুঁটির গায়ের দাঁড়াল হেলান দিয়ে, আঙুল বোলাল নিজের ভেজা চুলে, মুখে; তারপর সামনে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করল। সে টেলিফোনের খুঁটিকে দুইহাতে আলিঙ্গন করল, কাঁধ আর মাথা হেলিয়ে দিল পেছনে যতদূর সম্ভব, বৃষ্টির ধারা আছড়ে পড়ছে তার মুখে, গড়িয়ে যাচ্ছে কপাল, চুল আর গলা বেয়ে, বেশ ব্যথা হলেও সে পাগলের মতো খিকখিক করে হেসেই চলেছে; মজার নয়! মজার নয়! বোকামি নয়— একটা দেয়াল। দেয়ালের কাছে গিয়ে সে বুক চেপে ধরল। দেয়ালটা ভেজা, অমসৃণ। আরে রাস্তার ওপারেও একটা দেয়াল! সে পাগলের মতো খিকখিক করে হাসছে, পাগলের মতো খিকখিক করে হাসছে— অনন্তকাল ধরে। 'এটা কেমন জানো না। সবকিছু এটারই মতো। তুমি কি জানতে না! অবশ্যই— এখন অন্ধকার, তুমি কারো চোখ তুলে নিতে পার, কিন্তু আলো আনতে পার না, বাল্ব আনতে পার না, এখানেই পথের শেষ।' ধীরে ধীরে সে শান্ত হল। বসে রইল

পাথরের উপর, দুই পা মুড়ে, হাঁটুতে মুখ গুঁজে। মেডিটেশন। অন্তর্দর্শন। অন্তর্বিশ্লেষণ। জাহান্নামে যাক সব। খেয়াল হল সে কাঁপছে। ঘটনাক্রমে পাথরটাও শেষ হয়েছে শেষপ্রান্তে এসে। হয়তো তা নয়— এই শেষ প্রান্তে হয়তো শুধু নিশ্চয়তার রজ্জুটাই শেষ হয়েছে। এখনই হয়তো বিদায় নেবার শ্রেষ্ঠ সময় এবং চিন্তা ও ধারণার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে নির্ধারণবাদ নিয়ে চিন্তা করার সময়। অ্যাসপিরিন। বাতিল জিনিসে বোঝাই প্লাইউডের বাক্স। তলাবিহীন একটা নদী। শেষ প্রান্ত।

সে রাস্তার ওপাশে আলোর লকলকে জিভগুলো দেখতে শুরু করেছে। লাফিয়ে উঠে সে নিজেকে বাড়িটার সঙ্গে চেপে ধরল। সরু গলির মধ্যে একটা গাড়ি আর্তনাদ করে উঠল। গাড়িটা এক মুহূর্তের জন্য থামল, চত্বরের দিকে এগুলো, ঘুরে এল, রাস্তায় উঠে এল এবং আবার দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে এল মাঝবয়সী এক ব্যক্তি, একহাতে কাঁধের উপর ধরে রেখেছে রেইনকোট, আরেকটাতে খবরের কাগজে মোড়া বড়সড় একটা জিনিস। লোকটা কুঁজো হয়ে ছুটে গিয়ে ঢুকল সবচেয়ে কাছের বাড়িটিতে, তাড়াহুড়ো করে দরজা খোলা রেখেই উঠতে শুরু করল সিঁড়ি দিয়ে।

তার মাথা ঘুরছে। রাস্তা ও বাড়িগুলো অকস্মাৎ নড়তে শুরু করল; মনে হচ্ছে সমস্ত ব্লক কাঁপছে, পানিতে গলে যাচ্ছে, শুধু বৃষ্টি নামছে তার মুখ বেয়ে। এ কি আমার পা? এই প্রতিধ্বনি কি আমার হাঁটার? এ কি আমার হৃদস্পন্দন— মনে হচ্ছে রেলগাড়ি চলছে, চারিদিকে কিছুই নেই, শুধু বৃষ্টির ফোঁটাগুলো নেমে আসছে... শুধু... শুধু... পুরনো শহরের বাড়িগুলো আবার বৃষ্টিতে নড়ে উঠল— ওগুলোকে এখন আরো অতিকায় ও ভীতিকর দেখাচ্ছে। আবার তারা বাতাসে ঝাঁপ দিচ্ছে। মনে হচ্ছে এক বাড়ি পর পর বিল্ডিংগুলো ঝাঁকি খাচ্ছে, নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ছে ধীরে ধীরে। দেয়াল থেকে খসে পড়ছে ইটের টুকরো, ঝাঁকি খাচ্ছে, ধোঁয়া উঠছে। এখান থেকে সরে যেতে হবে। এখান থেকে সরে যেতে হবে! কিভাবে জানে না, কিন্তু সে ইতোমধ্যেই গাড়িটার ভেতরে ঢুকে স্টিয়ারিং ধরে বসেছে। বিশ্বের কথা ভাবো, শান্ত হও, ভয় পেয়ো না, শান্ত হও বাছা, এটাই সেই জিনিস। গাড়িটা সম্মুখে লাফ দিল, সরু গলি ছেড়ে বেরিয়ে এল। রিয়ার ভিউ মিররে দেখা গেল একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে অসহায়ভাবে, দৌড়ে এল কয়েক পা, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল পাথরের উপর। তৃতীয় বারের মতো সবকিছু বাতাসে লাফিয়ে উঠল এবং নিচে পড়তে শুরু করল; নেমে যাচ্ছে, ধোঁয়া, তীক্ষ্ণ শব্দ, গোলমাল, ভীতি, শঙ্কা, জোরে জোরে, এখান থেকে বেরুতে হবে। গাড়ির চাকা যেন পাথরের রাস্তা স্পর্শ করছে না, গড়াচ্ছে সরুগলিতে, একটা বাঁক, তারপরে আরেকটা। তৃতীয় বাঁক, এটি অন্যদিকে, সবশেষে একটা আর্তনাদ, গাড়ি লাফিয়ে পড়ল পুরনো শহরের প্রধান রাস্তায়। ব্রেক থেকে বেরুচ্ছে অদ্ভুত আর্তস্বর, বেঁকে গেছে স্টিয়ারিং হুইল; সে ওটা ঠিক জায়গায় আনল, গাড়ি সগর্জনে উড়ে যাচ্ছে। মিটমিটে আলোগুলো একত্রিত হয়ে একটা আগুনের কুণ্ডলীতে পরিণত হয়েছে; জোরে,

আরো জোরে, ট্রাফিকের আলো, একটা হলুদ আলো, এক বৃদ্ধা ভীত বিড়ালের মতো একদিকে লাফ দিল, খসে পড়েছে তার কাঁধের ব্যাগ, একটা বাঁক। পৃথিবীটা জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছে— সাইডস্ট্রিট, রাস্তা, ট্রলিবাস, দোকানের জানালা, মানুষের মুখ, আলো এবং ছায়া সব একাকার— সবকিছু পিছলে যাচ্ছে, ঘুরছে লাট্টুর মতো, আলাদা হয়ে যাচ্ছে, ছিটকে যাচ্ছে যেন অভিকর্ষের সূত্র স্থবির হয়ে পড়েছে। অবশেষে সে পৌঁছাল শহরতলীতে। সামনে তীরের মতো সোজা রাস্তা দেখে সে গ্যাস পেডালে চাপ বাড়াল আরো। উইন্ডস্ক্রিনের ওয়াইপার নিখুঁত ছন্দে বৃষ্টির জল মুছে চলেছে, হেডলাইটের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে ঝোপ-ঝাড়, গাছ আর দোকানের সাইনবোর্ডগুলো। আরে বাঁক! গাড়ির কন্ট্রোল হারিয়ে গেছে। স্টিয়ারিং হুইল কোথায়! পিছলে রাস্তার একেবারে কিনারে চলে এল গাড়িটা। ইরিনা, মনিকা, বাচ্চার চ্যাঁচামেচি, একটা অর্ধেক খালি টুথপেস্টের টিউব, যাও অথবা থাক, পড়ে যায়, ভেঙে যায়, আমি বাইরে যাচ্ছি, বাল্ব কিনতে, আমরা অন্ধকার কুয়ায় মাছ ধরছি, এমন জায়গায় খুঁজে মরছি যেখানে কিছুই নেই, সকালে ঘুম ভেঙে আমরা একে অপরকে জিগ্যেস করি আমরা কোথায়? কোত্থেকে এসেছি? এখানে এখানে? কোথায়? আমরা এতই নিঃসঙ্গ, একে অন্যের কাছে এতই অচেনা, আমরা সেই জিনিসটি খুঁজছি, যা সবকিছু বদলে দেবে, ধরা যাক, আলোর বাল্বটি, ধরা যাক... সবকিছু। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। এভাবেই সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে। একটা নড়বড়ে সোফা। বাতিল জিনিসে বোঝাই প্লাইউডের বাক্স। রাত্রিবেলা উড়ে চলা গাড়ি। সে একটা রেলক্রসিং দেখতে পেল, কেঁপে উঠল যখন দেখল যে গার্ডরেইল নেমে আসছে। যখন বুঝল সে সময়মতো থামতে পারছে না, যখন সে একটু দূরের বাঁকে ট্রেনের চকচকে বাঁকানো দেহটি দেখতে পেল। চোখের নিমেষে সে অ্যাক্সিলেটর দাবাল সর্বশক্তিতে। ট্রেনটা একেবারে নাকের ডগায়— ধোঁয়া ছাড়ছে, কর্কশ শব্দ করছে। রেলের পাতকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে টায়ারের কান ফাটানো শব্দ, ধাতব ঘস ঘস শব্দে, অতীত এবং ভবিষ্যতের ফোঁপানি, হৃৎপিণ্ডের ড্রাম বাজানো শব্দে যে কারো কান ফেটে যাবে— অ্যাসফল্টের উপরে স্কিড করে গাড়িটা অবশেষে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্টিয়ারিং হুইলের উপর নেতিয়ে পড়ে সে শুনল ট্রেনের চাকার ভীতিকর শব্দটি দূরে সরে যাচ্ছে।

দরজা খুলে সে সাবধানে, ধীরে ধীরে নেমে মাটিতে পা রেখে দাঁড়াল। টলমল পায়ে পড়ে গেল রাস্তার পাশের খাদের মধ্যে। বৃষ্টি থেমে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে গাছের বিশাল দেহগুলো পাতা আর ডাল খসিয়ে আকাশে মেঘের মতো ভাসছে। কান পাতলে ঘন শাখাগুলোর কোলাহল শোনা যায়, দেখা যায় কিভাবে সেই পানি পান করছে, কিভাবে সেই পানি পেয়ে মাটির শুকিয়ে যাওয়া ঘাসগুলো হেসে উঠছে। সে পুরনো বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল, শুনল পানির শব্দ, চেষ্টা করল বৃক্ষ, আকাশ, পানি, আবহমান পুনরাবৃত্তি এবং এগুলোর সমষ্টির বাইরে

কিছু অনুভব করতে, একটা ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব যেখানে অসম্ভব। সেটা কি আছে যা ছাড়া আমরা আদৌ বাঁচতে পারি না? সুতরাং সুতোর শেষপ্রান্ত খোঁজার কাজ আবার শুরু হয়। যেন অন্ধকার কুয়ার মাছধরা, কারণ, সর্বোপরি 'যাকে বাল্ব বলা হয়, তা আদৌ বাল্ব নয়', আদৌ নয়। এবং আবার সবকিছু শুরু হয় শুরু থেকেই, এবং এভাবেই চলতে থাকে, প্রতিদিন।

পল্লী চিকিৎসক

ফ্রানজ কাফকা

[জন্ম ৩ জুলাই ১৮৮৩। মৃত্যু ৩ জুলাই ১৯২৪। জার্মান ভাষায় লিখলেও চেক নাগরিক। পরবর্তী প্রজন্মগুলোর ওপর এতটা প্রভাবসম্পাতি লেখক খুব কমই জন্ম নিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যে]

[গল্প প্রসঙ্গে: 'পল্লী চিকিৎসক' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৯ সালে, অর্থাৎ কাফকার মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে। কাফকার ফিকশনগুলোকে প্রচলিত মাপকাঠিতে যে যে কারণে মূল্যায়ন করা কঠিন, এই গল্পেও সেসব উপাদান বিদ্যমান। টমাস মান একবার আলবার্ট আইনস্টাইনকে কাফকার একটা বই পড়তে দিয়েছিলেন। তিনি তা ফেরত পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে 'এটা পাঠ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। এর পাঠোদ্ধার করার মতো যথেষ্ট জটিল এখনও হতে পারেনি মানুষের মন।' এই গল্পটি পড়তে হবে কাফকা যেভাবে চান, সেভাবেই, অর্থাৎ, প্রচণ্ডতম চাপা আবেগ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতার সমষ্টি নিয়ে। পিতা-পুত্র বা ঈশ্বর-মানবের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিচারে কাফকার পক্ষপাত শেষোক্তদের প্রতি। কাফকার লেখা পড়তে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এমন এক স্পর্শকাতর লেখককে আমরা নাড়াচাড়া করছি, যিনি সবসময় পথ খুঁজছেন অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটানোর, গল্প বলার নয়। অস্টিন ওয়ারেনের ভাষায় 'কাফকা কোনো নীতিবাগীশ সংস্কারক নন, বরং তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ শিল্পী এবং সেটাই তাঁর ধর্ম। পৃথিবী যেভাবে চলছে, সেভাবে গ্রহণ করতে তাঁর আপত্তি। জীবনের যন্ত্রণাময় জটিলতাগুলো নন্দনতত্ত্বে আনা সম্ভব শুধু তার রহস্যময়তার বিনিময়ে।' কাফকা একটা পথ তৈরি করেছিলেন ধার্মিকের মতো তাঁর সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে সবসময় সতর্কভাবে জীবন উন্মোচনে]

পরিস্থিতি খুব জাটিল। এক্ষুনি রওনা দিতে হবে আমাকে। মারাত্মক অসুস্থ একজন রোগী অপেক্ষা করছে আমার জন্য। এখান থেকে দশমাইল দূরে। ঘন বরফে ঢেকে আছে এই দশমাইল বুনো পথ। তুষারঝড় বয়েই চলেছে। আমার অবশ্য ছোট্ট একটা ঘোড়ার গাড়ি আছে। এসব পথে চলার উপযোগী বড় বড় চাকাওয়ালা ছোট গাড়ি। ফারের পোশাক গায়ে দিয়ে, হাতে যন্ত্রপাতিভরা ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায় আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি বাড়ির উঠোনে। কিন্তু রওনা দিতে পারছি না। কারণ গাড়ি থাকলেও আমার ঘোড়া নেই, কোনো ঘোড়া নেই। আমার

ঘোড়াটা মরে গেছে কাল রাতে; বরফে আর শীতে ভিজে ভিজে ক্লান্ত-অসুস্থ হয়ে। রোজ, আমার বাড়ির কাজের মেয়েটা গাঁয়ের এ-বাড়ি ও-বাড়ি ছুটে বেড়াচ্ছে একটি ঘোড়া ধার চেয়ে চেয়ে। কিন্তু আমি জানি, এমন রাতে কেউ ঘোড়া ধার দেবে না। তুষারের উপর তুষার জমছে আর আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি অসহায়ভাবে।

দরজা দিয়ে কাজের মেয়েটা ঢুকল লণ্ঠন হাতে, একাকী। কাউকে অবশ্য দোষও দেওয়া যায় না। কেই-বা চাইবে তার ঘোড়াটা মরে যাক! কিন্তু যেতে যে আমাকে হবেই। হতাশায় পরিত্যক্ত আস্তাবলের দরজায় লাথি হাঁকালাম সক্রোধে। মরচেপড়া ব্যাটউইং খুলে গেল। আর খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল ঘোড়ার গায়ের গন্ধ আর নিশ্বাসের ধোঁয়া। আমি অবাক হয়ে দেখলাম ভেতরে দড়িতে ঝোলানো একটা লণ্ঠন জ্বলছে। নীল চোখের একজন মানুষ হামাগুড়ির ভঙ্গিতে আধশোয়া হয়ে রয়েছে আস্তাবলের মেঝেতে। 'আমি কি বেরিয়ে আসব?' বলে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে লোকটা চার হাত-পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এল উঠোনে। এতটাই অবাক আমি হয়েছি যে কী বলব বুঝেই পেলাম না। কাজের মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে। সকৌতুকে বলল 'আপনি কি জানতেন, নিজের বাড়িতেই কী দেখতে পাবেন?' দু'জনেই হেসে উঠলাম। আরও খুশি হয়ে দেখলাম, আস্তাবলে রয়েছে দুই-দুইটা ঘোড়া, দারুণ শক্তিশালী গড়নের। এতক্ষণ উটের মতো মাথা গুঁজে শুয়ে ছিল ওরা, কিন্তু মানুষের সাড়া পেয়ে নিমেষে উঠে দাঁড়িয়েছে। সহিস লোকটা বিনা বাক্যব্যয়ে লাগাম পরানো শুরু করল, যেন সে সব জানে। আমি 'ওর সাথে হাত লাগাও' বলার সাথে সাথে কাজের মেয়েটা সহিসকে সাহায্য করতে এগুলো। কিন্তু কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সহিস জাপটে ধরল মেয়েটাকে, মুখ লাগাল গালের সাথে। সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। কোনোরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে ছুটে এল আমার পাশে, আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম ওর গালে ফুটে উঠেছে দুইসারি দাঁতের দাগ। 'শয়তান!' ক্রোধে জ্বলে উঠলাম, 'তোমাকে আমি চাবুকপেটা করব।' কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবলাম, আগন্তুককে চিনি না; তারচেয়েও বড় কথা, কেউই যখন সাহায্য করছে না, তখন এই লোকটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। লোকটাও সম্ভবত পড়ে ফেলেছে আমার মনের কথা। সে-ও কোনো উচ্চবাচ্য না করে কাজ চালিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িতে ঘোড়া জুড়ে দিয়ে বলল, 'উঠে পড়ুন।' এত সুন্দর একজোড়া ঘোড়ার গাড়ি আমি আগে কখনো চালাইনি। খুশিমনে উঠে বসলাম কোচায়ানের আসনে। বললাম, 'আমাকেই চালাতে হবে। তুমি তো আর রাস্তা চেনো না।

'অবশ্যই', বলল সহিস, 'আসলে আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না। আমি রোজের সঙ্গে থাকছি।'

'না!' আঁতকে উঠল রোজ। ঘুরেই দৌড় দিল তাড়া খাওয়া হরিণীর মতো। আমি

শুনতে পেলাম দরজায় শেকল আটকানোর শব্দ, তারপরেই তালা লাগানোর শব্দ। মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, বেচারি আলো নিভিয়ে ঘরের ভেতরেও লুকানোর জায়গা খুঁজছে, যাতে তাকে খুঁজে না পাওয়া যায়।

'তুমি আমার সঙ্গেই যাচ্ছ' আমি সহিসকে বললাম, 'তা না হলে আমিও যাব না। আমার যাওয়া খুব জরুরি হলেও মেয়েটাকে তোমার হাতে তুলে দেবার বিনিময়ে আমি যেতে রাজি নই।'

'যা, বাচ্চা যা!', বলে চেঁচিয়ে উঠে অকস্মাৎ ঘোড়ার পাছায় চাপড় মারল সহিস, তৎক্ষণাৎ আমার গাড়ির চাকা এমনভাবে ঘুরতে শুরু করল যেন প্রবল বন্যায় ভেসে যাচ্ছে কোনো কাঠের টুকরো। আমি শুধু শুনতে পেলাম আমার ঘরের দরজা ভেঙে পড়ার শব্দ, কারণ সহিস উন্মত্তের মতো আঘাত করছে সেটায়। পরক্ষণেই যেন আমি অন্ধ-বধির হয়ে গেলাম প্রবল তুষার আর ঝড়ের তাড়নায়।

মাত্র এক মুহূর্ত। দেখলাম আমি দাঁড়িয়ে আছি রোগীর বাড়ির সামনে। ঘোড়াগুলো একটা খুঁটির কাছে হেঁটে পৌঁছুল শান্তভাবে। তুষারঝড় থেমে গেছে। চারদিক চাঁদের আলোয় পরিষ্কার।

রোগীর বাবা-মা ছুটে এলো হন্তদন্ত হয়ে, পেছনে বোনও। আমাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে নামাল গাড়ি থেকে। তাদের উদ্বিগ্ন তাড়াহুড়ো দেখে আমিও কিছু বললাম না।

রোগীর ঘরটা খুবই গুমোট। একটা নিভন্ত স্টোভ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ইচ্ছে হল, একটা জানালা খুলে দেই। তবে তার আগে রোগীর পাশে একবার দাঁড়ানো উচিত। চুপসানো চেহারা রোগীর। জ্বর নেই, সর্দি নেই, গা গরম নেই, খালি গায়ে পালকের বিছানায় শুয়ে আছে ফ্যাকাশে এক তরুণ। আমার দিকে তাকাল সে শূন্যদৃষ্টিতে। আমি একটু ঝুঁকে ভালোভাবে তাকে দেখার চেষ্টা করতেই সে দুর্বল হাতে পেঁচিয়ে ধরল আমার গলা। ফিশফিশ করে বলল, 'আমাকে মরতে দাও ডাক্তার! মরতে দাও!'

চকিতে চারপাশে তাকালাম; সম্ভবত কেউ শুনতে পায়নি। একটু দূরে বাবা-মা দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে আশাভরা চোখে তাকিয়ে, বোনটা একটা চেয়ার এনে তার উপরে রাখছে আমার ডাক্তারি ব্যাগ। ব্যাগ খুলে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে করতে বললাম, 'এইসমস্ত ব্যাপারে ঈশ্বর মাঝে মাঝে খুবই সদয়। হারানো ঘোড়াও পাইয়ে দেয়, তার সাথে আরও একটা জুড়ে দেয়, উপরন্তু দান করে আস্ত একজন সহিসও...'

থেমে গেলাম। এতক্ষণে আবার মনে পড়েছে রোজের কথা। আহ কীই-বা করতে পারতাম আমি! কিভাবে রক্ষা করতে পারতাম মেয়েটাকে! মনে হল, এক্ষুনি আবার

ফিরে যাই! কিন্তু এই দশমাইল রাস্তা উজিয়ে কিভাবে যাব, যেখানে এই ঘোড়াগুলোও ষড়যন্ত্রের অংশীদার। ওদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও আমার হাতে নেই।

ঘোড়াদুটো কিভাবে যেন ইতোমধ্যে লাগাম খুলে ফেলেছে। বাইরে থেকে পাল্লা খুলে জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিল। ওরা কিভাবে এটা পারল শয়তান জানে। বাড়ির লোকেরা কাণ্ড দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেও দুই ঘোড়া একটুও বিচলিত না হয়ে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল রোগীর দিকে। হঠাৎ মনে হল, ঘোড়াগুলো আমাকে ফিরে যাবার জন্য তাগাদা দিচ্ছে, খুবই জরুরি তাগাদা, যেন আদালতের সমন। এসময়ে রোগীর বোন আমার ফারকোট খুলতে লাগল, হয়তো ভাবছে ঘরের মধ্যে আমি গরমে অস্বস্তি বোধ করছি। আমার জন্য একগ্লাস রামও এল। বাড়ির কর্তা আমার পিঠে আলতো চাপড় মেরে অভিজাত ঢঙে গ্লাসটি এগিয়ে দিলেন। আমি মাথা নাড়লাম। কর্তার হামবড়া ভাব আমার ভালো লাগেনি বলেই ড্রিংকস্‌টা প্রত্যাখ্যান করলাম। রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার মা। তার ইশারায় আমি রোগীর বুকে কান পাততেই আমার দাড়ির নিচে কেঁপে উঠল তরুণের বুক। ভান। আমি নিশ্চিত হলাম অসুখটা আসলেই ভান। সম্ভবত তার রক্ত সঞ্চালনে সামান্য ত্রুটি দেখা দিয়েছে, উৎকণ্ঠিত মা তাকে ঠেসে খাইয়েছে কফি। তবুও আমার মনে হল, একটা ধাক্কা দিলেই ছেলেটা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে। তবে সবাই কিছু না-কিছু ভান করে, এবং দুনিয়াটাকে পাল্টানো যেহেতু আমার একার কম্মো নয়, তাই ছেলেটাকে শুয়েই থাকতে দিলাম। ডাক্তার হিসেবে আমি সবসময়ই আমার কর্তব্য পালন করেছি। সত্যি বলতে কী, অনেক বেশিই করেছি। টাকা কম দিলেও আমি গরিব রোগীদের সাথে সবসময় ভদ্র ব্যবহার করি। এই মুহূর্তে আমি শুধু চাইছি, আমার কাজের মেয়েটা— রোজ যেন অক্ষত থাকে। ওহ্ এই অন্তহীন শীতের রাজ্যে আমি কী করে চলেছি! আমার ঘোড়াটা মরে গেল, প্রতিবেশী কেউ ঘোড়া ধার দিল না, তবু আমাকে আসতেই হবে। ঘোড়া না পেলে শুয়োরের পিঠে চেপে হলেও আসতে হবে। এই পরিবার জানে না, জানলেও বিশ্বাস করবে না, কিসের বিনিময়ে আমি আসতে পেরেছি তাদের রোগীকে দেখতে। প্রেসক্রিপশন করা খুব সোজা কিন্তু মানুষকে বুঝতে পারা খুব কঠিন। দিনরাত কলিংবেল বাজিয়ে সারাটা জেলা আমাকে উৎপীড়ন করে চলেছে। রোজ, সেই সুন্দর মেয়েটা, যে কয়েক বছর ধরে আমার সেবা করছে— এই রোগীর জন্য তাকে আজ উৎসর্গ করতে হয়েছে। পৃথিবীর কোনোকিছু কি এই উৎসর্গের সমান হবে!

সশব্দে ব্যাগ বন্ধ করে আমার ফারকোটের জন্য হাত বাড়ালাম। রোগীর বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রামের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। রোগীর মা এমনভাবে তাকাল যেন ভীষণ হতাশ হয়েছে আমার আচরণে। বেচারী জলভরা চোখে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। এরা আর কী আশা করতে পারে আমার কাছে? বোন একটা রক্তমাখা

তোয়ালে দেখিয়ে অনুরোধ করল আমি যেন আরেকবার রোগীকে দেখি। নাহ্, বিরক্তিতে আমি ভুরু কুঁচকালাম। এদের রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে স্বর্গ থেকে পাঠানো হয়েছে বার বার শুধু তাদের রোগী দেখার জন্যই। এদিকে ঘোড়াদু'টো চ্যাঁচাচ্ছে। তবু আমি আরেকবার শুয়ে থাকা তরুণের কাছে গেলাম এবং হঠাৎ আবিষ্কার করলাম— সে আসলেই ভয়ানক অসুস্থ। তার ডান পাঁজরে আমার হাতের পাঞ্জার সমান একটা ক্ষত। আরও ঝুঁকে পরীক্ষা করতেই নিজের অজান্তেই আমার কণ্ঠচিরে বেরিয়ে এলো অস্ফুট চিৎকার। ক্ষতজুড়ে কিলবিল করছে শত শত পোকা। একেকটা আঙুলের সমান লম্বা এবং মোটা। আহারে বাছা, এখন আর তোমার জন্য কিছুই করার নেই আমার! তোমার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে ধ্বংসদূত। পরিবারের লোকেরা এবার খুশি। তারা আমাকে ব্যতিব্যস্ত হতে দেখেছে। বোন খুশি হয়ে সে-কথা বলল মা-কে, মা বলল বাবাকে, বাবা বলল কয়েকজন পড়শিকে, যারা কাদার মধ্যে পা টিপে টিপে এসে হাজির হয়েছে রোগীর খোঁজখবর নিতে।

'আমাকে বাঁচান ডাক্তার! আপনি কি আমাকে বাঁচাবেন?'
এই এলাকার লোকেরা এরকমই। ডাক্তারকে দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করাতে চায়। লোকজন একে একে ঢুকছে ঘরে, গরম কাপড় খুলে রাখছে আর এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন ডাক্তার অলৌকিকভাবে সুস্থ করে তুলবে রোগীকে। এক্ষুণি। যাক গে, এই যদি তাদের মনোভাব হয়ে থাকে, আমি কী করতে পারি!

হঠাৎ করে কয়েকজন এগিয়ে এসে টেনে টেনে খুলতে লাগল আমার জামাকাপড়। আমি এক দুর্বল বুড়ো মানুষ, কীভাবে আমার একার পক্ষে বাধা দেওয়া সম্ভব! বাড়ির সামনের বোর্ডিংস্কুলের ছাদ থেকে চিৎকার করে সমস্বরে গান জুড়ল ছাত্ররা, তাদের শিক্ষকের নেতৃত্বে—

কাপড় খুলে নাও, তাহলে সে আমাদের সুস্থ করবে
যদি না করে, তাহলে তাকে হত্যা করো
ভারী তো এক ডাক্তার! ভারী তো এক ডাক্তার

ততক্ষণে আমার সব কাপড় খুলে নেওয়া হয়েছে। আমি দাড়িতে আঙুল ঢুকিয়ে মাথা কাত করে তাকিয়ে রইলাম তাদের দিকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এবার ওরা আমার চার হাত-পা ধরে চ্যাংদোলা করে তুলল বিছানায়। শুইয়ে দিল দেয়াল এবং রোগীর মধ্যেকার ফাঁকটুকুতে। তারপর সবাই বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। বাইরে থেকে বন্ধ হল দরজা, থেমে গেল গান।

চাঁদকে বোধহয় ঢেকে ফেলেছে মেঘ। বিছানা বেশ উষ্ণ, আরামদায়ক। জানালায় ঘোড়ার মাথাদুটোকে দোলায়মান ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে। আমার কানের কাছে ফিশফিশ শব্দে উচ্চারিত হল 'শোনো, তোমার ওপর আমার ভরসা খুবই কম।

কেননা তোমাকে এখানে তুলে আনা হয়েছে; তুমি নিজের পায়ে হেঁটে আসোনি। আমাকে সাহায্য করার বদলে তুমি আমার মৃত্যুশয্যাকে আরো বেশি কষ্টকর করে তুলছ। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার চোখদুটো খুবলে তুলে ফেলি।'

'ঠিকই তো।' আমি বললাম, 'খুবই লজ্জার কথা। যদিও আমি একজন ডাক্তার, তবু তুমিই বল, আমার কী করার আছে। বিশ্বাস কর, এটা আমার কাছে কোনোমতেই সহজ কিছু নয়।"

'তুমি কি মনে করো, তোমার ক্ষমাপ্রার্থনাতেই আমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত? এমন সুন্দর একটা ক্ষত আমি পৃথিবীতে আনতে পেরেছি, এটা আমার আত্মিক যোগ্যতার নিদর্শন।'

'তরুণ বন্ধু', আমি বললাম, 'তোমার ভুলটা হচ্ছে, কারণ, তোমার দৃষ্টিভঙ্গি তেমন প্রসারিত নয়। দূরের-কাছের অনেক রোগী আমি দেখেছি। সত্যি বলছি, তোমার ক্ষতটা মারাত্মক নয়।'

'তুমি কি সত্যি কথা বলছ? নাকি আমি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ শুনছি?'

'আমি সত্যি বলছি! একজন সরকারি ডাক্তার হিসেবে যতখানি সত্যি বলা সম্ভব।'

সে আমার কথা মেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এখন আমার নিজেকে বাঁচানোর কথা ভাবতে হবে। ঘোড়াগুলো বিশ্বস্ততার সাথে দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড়, ফারকোট, ব্যাগ কুড়িয়ে নিলাম। কাপড় পরতে গিয়ে সময় নষ্ট করে কাজ নেই। যে গতিতে ঘোড়াগুলো আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সেই গতিতে ফিরে যেতে পারলে এই বিছানা থেকে আমার নিজের বিছানা মাত্র একলাফের দূরত্ব।

ইশারা করতেই ঘোড়াদুটো বাধ্য ছেলের মতো জানালা ছেড়ে সরে গেল। আমি জিনিসপত্র জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম গাড়ির দিকে। ফারকোটটি জায়গামতো না পড়লেও একটা হুকের সাথে ঝুলে রইল। যথেষ্ট। এবার আমি জানালা টপকে নিজেকে স্থাপন করলাম একটা ঘোড়ার পিঠের উপর। লাগামে টান দিতেই একটার পিছনে আরেকটা ঘোড়া, তার পেছনে গাড়িটা এবং তুষারে ছেঁচড়ে থাকা ফারকোটটা চলতে শুরু করল।

'ছুটে চলো বাছারা।' তাড়া দিলাম বার বার। কিন্তু সেই ঝড়োগতি নেই ঘোড়ার পায়ে। বুড়ো মানুষের মতো ঘোড়াদুটো ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলল আবর্জনা আর তুষারভরা পথ দিয়ে। আমার কানের পর্দায় অনেকক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনি তুলল ছাত্রদের একটা নতুন গান—

আনন্দ করো সব রোগীরা
ডাক্তারকে শোয়ানো হয়েছে তোমাদের পাশে

মনে হচ্ছে এই গতিতে চললে আমি কোনোদিনও বাড়ি পৌঁছুতে পারব না। আমার জমজমাট পসার দেখে আমার পরবর্তী বদলি ডাক্তার এই এলাকায় আসার তোড়জোড় করছে। কিন্তু বৃথা! সে কিছুতেই আমার জায়গা দখল করতে পারবে না। সে কি আমার মতো বলিদান করতে পারবে? আমার বাড়িতে ঘৃণ্য সহিসটা উন্মত্ত লালসায় ছিন্নভিন্ন করছে রোজকে। আমি আর ভাবতে পারছি না। আমার ফারকোট গাড়ির সাথেই ঝুলে আছে, তবু আমি হাত বাড়িয়ে সেটা নেবার জন্য সময় নষ্ট করতে পারছি না। উলঙ্গ অবস্থায় বরফের কামড় সইতে সইতে আমি পথ চলেছি। আমি ডাক্তার। তবু আমার ভক্ত কোনো রোগী কখনোই আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে না। অকৃতজ্ঞ। সব অকৃতজ্ঞ!

ঘড়িতে বেজে উঠল অসময়ের অ্যালার্ম। এটাকে আর ঠিক করা যাবে না। একেবারেই না।

কালাপানি দ্বীপে

ফ্রানজ কাফকা

'অসাধারণ মেশিন!'

তদন্তকারীর উদ্দেশে কথাটি বলে কিছুক্ষণ যন্ত্রটির দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অফিসার; যদিও যন্ত্রটি তার খুবই পরিচিত।

একজন সেপাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে অবাধ্যতা ও তার ঊর্ধ্বতন অফিসারকে অপমান করার অপরাধে। কমান্ডান্টের বিশেষ আমন্ত্রণে শুধুমাত্র ভদ্রতার খাতিরে তদন্তকারী রাজি হয়েছেন মৃত্যুদণ্ডের এই অনুষ্ঠানটি দেখতে। কলোনিতে অবশ্য এই মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে কোনোই সাড়া জাগেনি। এই ছোট্ট বালুঢাকা উপত্যকায়, যা আসলে চারদিক রুক্ষ পাহাড়ঘেরা গর্তের মতো, কেউ আসেনি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা দেখতে। উপস্থিত বলতে শুধু অফিসার, তদন্তকারী, সাজাপ্রাপ্ত সেপাইটি—নির্বোধ চেহারার চওড়া মুখ ও কোঁকড়া চুলের এক প্রাণী, আর আছে আরেকজন সেপাই, যে ধরে আছে শেকলের একপ্রান্ত। শেকলটি পেঁচিয়ে রেখেছে দণ্ডপ্রাপ্ত সেপাইটির হাত-পা-গলা। দণ্ডপ্রাপ্ত লোকটিকে এমন নিরীহ কুকুরের মতো লাগছিল, যে কেউ দেখলে ভাববে, তাকে বোধহয় চারপাশের পাহাড়গুলোর দিকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেওয়া যায়। বাঁশিতে যখনই দণ্ডপ্রক্রিয়া শুরুর ফুঁ পড়বে, তখনই।

যন্ত্রের দিকে তদন্তকারীর তেমন মনোযোগ নেই। তিনি বরং একটু পায়চারি করলেন আসামির সামনে-পেছনে। অফিসার ততক্ষণে ব্যস্ত যন্ত্রটাকে ঠিকভাবে

অ্যাডজাস্ট করতে। এই দেখা গেল যন্ত্রের তলায় বুকে হেঁটে ঢুকে যাচ্ছে, পরমুহূর্তেই মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে যন্ত্রের মাথায়। এই কাজটা যে কোনো মেকানিক করতে পারত, কিন্তু অফিসার নিজে খুবই উৎসাহের সঙ্গে কাজটা করছে। এর কারণ— হয় সে যন্ত্রটার প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট অথবা অন্য কারও হাতে কাজটা দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

'এবার হয়েছে'। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে নিচে নেমে এল। একটু খোঁড়াচ্ছে, শ্বাস নিচ্ছে মুখ হা করে। তার কলারের কাছে আটকানো দুটো লেডিস রুমাল।

'গরমের দেশ হিসেবে এই ইউনিফর্ম নিশ্চয়ই ভারি হয়ে যায়।' অফিসার ভাবছিল তদন্তকারী কথা বলবেন যন্ত্র নিয়ে। কিন্তু কথা উঠল পোশাক সম্বন্ধে।

'অবশ্যই।' বালতির পানিতে তৈলাক্ত হাত ধুতে ধুতে অফিসার বলল— 'মাঝে মাঝে অবশ্য ভুলভ্রান্তি হয়। তবে আশা করছি আজ কোনো অসুবিধা হবে না। কিছু ত্রুটির জন্য তবুও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। মেশিনটা একনাগাড়ে বারো ঘণ্টা সচল থাকবে। কোনো ত্রুটি দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবেই ঠিক করা যাবে। আরে, আপনি দাঁড়িয়েই আছেন যে! প্লিজ বসুন। চেয়ারের গাদা থেকে একটা বেতের চেয়ার এগিয়ে দিল অফিসার। তদন্তকারী প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। একটা গর্তের একপাশে খুঁড়ে তোলা মাটির স্তূপ, অন্যপাশে যন্ত্রটি। অফিসার বলল— 'আমি জানি না কমান্ডান্ট আপনাকে এই যন্ত্রটি সম্পর্কে কিছু জানিয়েছেন কি না।'

উত্তরে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন তদন্তকারী। অফিসার ধরে নিল, জানানো হয়নি। বেশ খুশি হয়ে বলল— 'এই যন্ত্রটা আবিষ্কার করেছিলেন আমাদের আগের কমান্ডান্ট। খুব ছোট-খাট প্রাথমিক এক্সপেরিমেন্টের সময় আমি সাহায্য করেছি। তাছাড়া পুরো যন্ত্রটা তৈরি হওয়া পর্যন্ত সবসময় কাজ করেছি। কিন্তু তাহলেও এই যন্ত্রটা উদ্ভাবনের পুরো কৃতিত্ব তার একার। আপনি কি আমাদের পূর্ববর্তী কমান্ডান্ট সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? শোনেননি? বেশ, ধরুন যদি বলি যে, এই পুরো দ্বীপের যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থা তিনি একাই তৈরি করেছিলেন, তাহলে কিন্তু মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না। এইসব বিধি-ব্যবস্থা এতই নিখুঁত যে, বর্তমান কমান্ডান্টের মাথায় হাজার আইডিয়া থাকলেও আগের বিধিগুলোর একটিও তিনি পরিবর্তন করতে পারবেন না। অন্তত আরো বেশ অনেকগুলো বছর পর্যন্ত। এবং আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্য, তা আমাদের বর্তমান কমান্ডান্ট স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আফসোস, আপনি আমাদের পূর্বতন মহান কমান্ডান্টের সাক্ষাৎ পাননি। তবে, একটু বিরতি দিল অফিসার, তারপর বলল, 'তবে আপনার সামনে আছে তার আবিষ্কৃত যন্ত্র। দেখতেই পাচ্ছেন, এই যন্ত্রের তিনটি অংশ। এই তিন অংশের তিনটি জনপ্রিয় ডাকনাম আছে। নিচের অংশের নাম বেড, ওপরের অংশের নাম ডিজাইনার। আর এই যে মাঝখানের অংশ, যেটা ওঠে-নামে, এটার নাম হ্যারো বা বিদারক।'

'হ্যারো?' জিগ্যেস করলেন তদন্তকারী।

আসলে তিনি তেমন মনোযোগ দিয়ে শুনছেন না। ছায়াহীন উপত্যকায় সূর্যের প্রখর উত্তাপ। এই গরমে কোনো কিছুতে মনোযোগী হওয়া খুবই কঠিন। খুব বেশি হলে যা তিনি করতে পারেন, তা হচ্ছে অফিসারের প্রশংসা করা। এই রোদেও ভারি মোটা ইউনিফর্ম পরে সে আন্তরিকতার সাথে কথা বলে যাচ্ছে, আবার একই সাথে একটা স্প্যানার নিয়ে এখানে-ওখানে স্ক্রু টাইট দিচ্ছে। সেপাইটাকে দেখে মনে হচ্ছে, তার অবস্থা তদন্তকারীর মতোই। একহাতে আসামির শেকল ধরে, অন্যহাতে রাইফেলে ভর রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, কোনোদিকে আগ্রহ নেই। এতে অবশ্য তদন্তকারী মোটেই অবাক হলেন না। কারণ অফিসার কথা বলছে ফরাসিতে। এবং নিশ্চিত বলা যায়, আসামি বা সেপাই, কেউই একটাও ফরাসি শব্দ জানে না। অফিসারের ব্যাখ্যা আসামিকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারছে না। ঝিমিয়ে পড়া চোখে সে তাকিয়ে আছে অফিসারের দিকে। অফিসার কোনোকিছুর দিকে আঙুল তুললে সে-ও ঘোরলাগা দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাচ্ছে। তদন্তকারীর প্রশ্নে অফিসারের মতো সে-ও ঘুরে তাকাল তার দিকে।

'হ্যাঁ হ্যারো।' অফিসার বলল— 'উপযুক্ত নাম। দেখুন, সুচগুলো সাজানো আছে করাতের দাঁতের মতো, আর পুরো জিনিসটা সেভাবেই কাজ করে। তবে খুবই শৈল্পিক। শিগগির বুঝতে পারবেন। বেডে দণ্ডপ্রাপ্তকে শোয়ানো হয়... কাজ শুরুর আগেই আমি যন্ত্রটা সম্পর্কে বিশদ বুঝিয়ে বলছি। তাহলে আপনি পুরো পদ্ধতিটা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। তাছাড়া ডিজাইনারের একটা দন্তচক্র খুব নড়বড়ে হয়ে গেছে, চালু হলে এতই শব্দ হয় যে, আপনি নিজের কথা নিজেই বুঝতে পারবেন না। দুর্ভাগ্যবশত এখানে স্পেয়ার পার্টস পাওয়া খুব কঠিন। যাকগে, এর নাম বেড, এর উপরে দণ্ডিত ব্যক্তিকে শোয়ানো হয় উপুড় করে। অবশ্যই সম্পূর্ণ নগ্ন করে। এখানে দেখুন হাত, পা আর গলা বাঁধার ফিতা। বেডের মাথার কাছে এই দেখুন একটা ফেল্টের তৈরি গ্যাগ। এটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় মুখের মধ্যে। চেঁচানো এবং জিভে কামড় লাগা বন্ধ করার জন্য । জোর করেই ঢোকাতে হয় অবশ্য।

'ওই তুলো আর উলের কী কাজ?' জিগ্যেস করলেন তদন্তকারী।

'বলব অবশ্যই।' মৃদু হেসে বলল অফিসার, 'নিজে একবার পরখ করে দেখুন।' তদন্তকারীর হাত টেনে নিয়ে বেডে ঠেকাল অফিসার— 'এটা বিশেষভাবে তৈরি, সেজন্যই দেখতে অন্যরকম লাগছে। কেন তা বলছি।'

তদন্তকারী যন্ত্রটি সম্পর্কে মোটামুটি উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। কপালে হাত ঠেকিয়ে সূর্যের আগ্রাসন থেকে চোখ বাঁচানোর চেষ্টা করে যন্ত্রটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। বেশ বড়সড় ব্যাপার। বেড আর ডিজাইনারের আকার সমান। দেখতে দুটো গাঢ় কাঠের টেবিলের মতো। বেড থেকে দুই মিটার উঁচুতে ঝুলে

আছে ডিজাইনার। ভর দিয়ে আছে চারকোণায় চারটে পিতলের রডের উপর। সূর্যের আলো পিছলে যাচ্ছে সেগুলোতে পড়ে। হ্যারো এই দুই অংশের মধ্যে আসা-যাওয়া করে ইস্পাতের পাতের সাহায্যে।

তদন্তকারীর প্রথম দিককার ঔদাসীন্য তখনই খেয়াল করেছিল অফিসার। আবার এখন ক্রমবর্ধমান আগ্রহ সম্বন্ধেও সে সচেতন। তাই একটু দেখার সুযোগ করে দেবার জন্য কথার মধ্যে বিরতি দিল খানিকটা।

'লোকটাকে শোয়ানো হল। তারপর?' চেয়ারে হেলান দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিলেন তদন্তকারী।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', টুপিটা একটু পেছনে ঠেলে দিয়ে গরম হয়ে যাওয়া মুখে হাত বুলিয়ে অফিসার বলল— 'বলছি শুনুন। বেড এবং ডিজাইনার— দুটোর সঙ্গেই একসেট করে ব্যাটারি আছে। বেড-এর নিজের জন্য একটা আর ডিজাইনার-এর সাথে যে ব্যাটারিটা আছে সেটা কাজে লাগে হ্যারোর। লোকটাকে বেঁধে ফেলার সাথে সাথে বেড কাঁপতে শুরু করে। প্রতি মিনিটে ঝাঁকি হয় সামনে-পেছনে এবং উপর-নিচে। হাসপাতালে আপনি এ ধরনের যন্ত্র দেখতে পাবেন। তবে আমাদেরটার প্রতিটি ঝাঁকুনি হিসাব করা। এর ঝাঁকুনি হ্যারোর নড়াচড়ার সাথে তাল মেলানো নিখুঁতভাবে। আর হ্যারোই হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আসল অংশ।'

তদন্তকারী জিগ্যেস করলেন— 'রায় দেওয়া, মানে বিচার পদ্ধতিটা ঠিক কেমন?'

'আপনি সেটাও জানেন না!' আশ্চর্য হয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে জিগ্যেস করল অফিসার— 'আমার কথাটা অসংলগ্ন মনে হলে মাফ করবেন। আসলে জানেন কি, সব সময় কমান্ডান্টই এটা ব্যাখ্যা করে থাকেন। অথচ নতুন কমান্ডান্ট এই দায়িত্বটা পালন করেননি। এমন একজন মান্যবর অতিথি অথচ...'

তদন্তকারী তোষামোদে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন হাত তুলে। কিন্তু অফিসার বলেই চলল— 'আপনার মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ অতিথির কাছেও ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা হয়নি, এ তো তাজ্জব কথা!' একটা কঠিন কথা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল অফিসার। বলল— 'আমি জানতাম না। এটা আমার দোষ নয়! যাকগে, এই পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে যারা পারে— আমি তাদের মধ্যে সেরা একজন লোক, আর আমি যেহেতু উপস্থিত আছি', বুকপকেটে টোকা দিল অফিসার, 'এর উপযুক্ত ড্রইংগুলো করেছিলেন আমাদের সুযোগ্য পূর্বতন কমান্ডান্ট।'

'কমান্ডান্টের নিজের ড্রইং? জিগ্যেস করলেন তদন্তকারী, 'তাহলে কি তিনি সবকিছুই নিজে করতে পারতেন? তিনি কি একাধারে সৈনিক, বিচারক, মেকানিক, কেমিস্ট এবং ড্রাফটসম্যানও ছিলেন?'

'সত্যি বলতে কী— তাই। সবই তিনি ছিলেন।' বিষণ্নভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে অফিসার

বলল উদাস স্বরে। তারপর নিজের হাতদুটো পরখ করতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মনে হল ড্রইংগুলো স্পর্শ করার মতো যথেষ্ট পরিষ্কার নয় হাত দুটো। বালতির কাছে গিয়ে আবার সে হাত ধুয়ে এল। তারপর পকেট থেকে বের করল একটা খুদে চামড়ার ওয়ালেট। বলল— 'আমাদের শাস্তিদান খুব একটা হইচই-এর ব্যাপার নয়। যে ব্যাপার সংশ্লিষ্ট ঘটনায় কেউ অবাধ্য হত কমান্ডান্ট সেই কথাটা তার পিঠে লিখে দিতেন। যেমন ধরুন, এই আসামির পিঠে লেখা হবে— তোমার ঊর্ধ্বতনকে সম্মান জানাও।'

তদন্তকারী আসামির দিকে তাকালেন। লোকটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে কান খাড়া রেখেছে। বুঝতে চাইছে, তাকে নিয়ে কী আলোচনা চলছে। তার মাছের পেটের মতো ঠোঁট দুটো পরস্পর সাঁটা দেখে বোঝা যাচ্ছে, একটা শব্দও সে বোঝেনি।

তদন্তকারীর মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। তবে তিনি শুধু জিগ্যেস করলেন— 'এই লোকটা কি তার বিচার সম্বন্ধে বা সাজা সম্বন্ধে কিছু জানে?'

'না।'

'লোকটা জানেও না তার প্রতি কোন শাস্তির আদেশ হয়েছে?'

'না।' একটু থেমে উত্তর দিল অফিসার— 'তাকে জানানোর কোনোই প্রয়োজন নেই। শাস্তি শুরু হলে সে নিজের শরীরের মাধ্যমেই তা জানতে পারবে।'

তদন্তকারীর আর কোনো কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু তিনি অনুভব করলেন আসামি তার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে, যেন সে জানতে চাইছে— যা কিছু ঘটছে তাতে কি তার সায় আছে? এই চিন্তা থেকেই তিনি সামনে ঝুঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তবে নিশ্চয়ই সে এটুকু অন্তত জানে যে তাকে সাজা দেওয়া হচ্ছে?'

'তারও কোনো দরকার নেই' মৃদু হেসে তদন্তকারীর দিকে তাকিয়ে বলল অফিসার, যেন তিনি এক আজব প্রশ্ন করেছেন।

'দরকার নেই?' ঘাম মুছে তদন্তকারী বললেন, 'তাহলে সে তো জানতেই পারবে না যে তার আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো কাজ হয়নি।'

'সে তো আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ পায়নি।' নির্বিকার গলায় বলল অফিসার। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন তদন্তকারী, 'কিন্তু আসামিকে অবশ্যই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।'

অফিসার বুঝল, যন্ত্রবিষয়ক আলোচনাটা স্থগিত হয়ে গেল বেশ কিছুক্ষণের জন্য। সে হেঁটে এগিয়ে গেল তদন্তকারীর কাছে। একহাতে তার হাত ধরে অন্য হাত তুলে দেখাল আসামিকে। আসামি তখন দাঁড়িয়ে রয়েছে টানটান, বুঝতে পেরেছে যে আলাপের কেন্দ্রবিন্দু সে-ই। সেপাইটাও সচকিত হয়ে একটা ঝাঁকি দিল শেকলে। অফিসার বলল, 'আমি বুঝিয়ে বলছি। যদিও আমি খুবই ছোট অফিসার,

তবু যেহেতু আগের কমান্ডান্টের সঙ্গে বিচার বিষয়ক কাজে জড়িত থাকতাম এবং এই যন্ত্রটা সম্বন্ধে আমিই সবচেয়ে বেশি জানি, তাই আমাকেই এই কলোনির বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে। আমার নীতি হচ্ছে— অপরাধী সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে নেই। অন্যান্য কোর্টে এই নিয়ম মানা সম্ভব হয় না, কারণ সেখানে জুরিদের বিভিন্ন মতামত থাকে। তাছাড়াও আছে উচ্চতর আদালতে আপিল। কিন্তু এখানে তা ঘটবে না। অন্তত আগের কমান্ডান্টের আমলে ঘটেনি। নতুন কমান্ডান্টের কিছুটা প্রবণতা আছে আমার কাজে হস্তক্ষেপ করার। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি তাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছি। আপনি মামলার বিবরণ শুনতে চান? মামলাটা সরল। আজ সকালে একজন ক্যাপ্টেন আমার কাছে রিপোর্ট করল যে এই আসামি তার দরজার সামনে ঘুমিয়ে ছিল— ডিউটির সময়ে। এই লোকটাকে ক্যাপ্টেনের চাকর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। তার ডিউটি হচ্ছে প্রতিঘণ্টায় ক্যাপ্টেনকে তো বটেই তার দরজাকেও স্যালুট করা। এটা কিন্তু মোটেই হেলাফেলার ডিউটি নয়, বরং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একই সাথে সে হচ্ছে চাকর এবং পাহারাদার। তাকে অবশ্যই চব্বিশ ঘণ্টা সজাগ থাকতে হবে। গতরাতে ক্যাপ্টেন দেখতে চাইলেন লোকটা ঠিকমতো ডিউটি করছে কি না। ঘড়িতে দুটোর ঘণ্টা বাজলে তিনি দরজা খুললেন এবং দেখলেন লোকটা বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। ক্যাপ্টেন তখন চাবুক দিয়ে ওর মুখে বাড়ি মারলেন। উঠে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ মাফ চাওয়ার বদলে লোকটা জাপটে ধরল ক্যাপ্টেনের পা আর চিৎকার করে বলল, 'চাবুকটা ফেলে দাও, নইলে তোমাকে আমি জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলব। তো এই হচ্ছে ঘটনা। ক্যাপ্টেন সকালে আমার কাছে এসেছিল। আমি তার জবানবন্দি লিখে নিয়ে এই শাস্তির রায় দিয়েছি। আসামিকে তৎক্ষণাৎ শেকলবন্দি করা হয়েছে। অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার। কিন্তু ধরুন, আমি যদি আসামিকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতাম, তাহলে পুরো ব্যাপারটাই জটিল হয়ে পড়ত। সে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলত, একটা মিথ্যা ঢাকতে আরো অনেক মিথ্যা কথা চলে আসত। সুতরাং আমি তাকে তা করার সুযোগ দেইনি। এবার নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। তবে আমরা কিন্তু সময় নষ্ট করছি। সাজা প্রক্রিয়া শুরু করা দরকার, অথচ এখনো আমি আপনাকে যন্ত্রটা সম্পর্কে সব কথা জানাতে পারিনি।'

পিঠে চাপ দিয়ে সে তদন্তকারীকে চেয়ারে বসিয়ে ফিরে গেল যন্ত্রের কাছে, 'দেখতেই পাচ্ছেন, হ্যারোর আকৃতি অনেকটা মানুষের মতো। এই হল ধড়, এটা হল পা। মাথার জন্য শুধু একটা কাঁটা। বুঝতে পেরেছেন তো?' অমায়িক হেসে জিজ্ঞাসা করল অফিসার।

তদন্তকারীর মনে হল হ্যারো তার দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করছে। বিচারপদ্ধতির ব্যাখ্যা তাকে মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এটা একটা বিশেষ ধরনের কলোনি। কাজেই এ ধরনের বিচারপদ্ধতিই লাগসই কিংবা সামরিক শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে হবে

যতদূর সম্ভব— এই ভেবে তিনি নিজেই নিজেকে এই পদ্ধতির সপক্ষে আনতে চাইলেন। কিন্তু তার মন এটা মেনে নিতে পারল না। তিনি আশা করলেন, নতুন কমান্ডান্ট এইসব ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবেন। তবে এই অফিসারের দল তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার জন্য তা বুঝতে অক্ষম। এই চিন্তা থেকেই উত্থিত হল তার পরবর্তী প্রশ্ন, 'কমান্ডান্ট কি মৃত্যুদণ্ড দেখতে আসবেন?'

'তার কোনো নিশ্চয়তা নেই', অফিসারের মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে উঠল, 'আমরা কোনো সময় নষ্ট করব না। এমনকি দরকার হলে এই যন্ত্রটা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা সংক্ষেপে সারব। যদিও সংক্ষেপে কোনোকিছু বলা আমি খুবই অপছন্দ করি। তবে আগামীকাল, যন্ত্রটা যখন পরিষ্কার করা হবে, আমি অবশ্যই আপনাকে খুঁটিনাটি জানাব। এখন শুধু প্রয়োজনীয় কথাগুলো। হ্যাঁ, মানুষটাকে বেডে শোয়ানো হলে এটা কাঁপতে থাকবে, হ্যারোকে নামিয়ে আনা হবে, ফিতাগুলো টানটান হয়ে পরিণত হবে শক্ত পাতে। তখনই শুরু হবে আসল কার্যক্রম। মূর্খরা একটা শাস্তির সাথে অন্য শাস্তির পার্থক্য খুঁজে পায় না। হ্যারো নিখুঁতভাবে নিয়মিত বিরতিতে কাজ করে। এটা যখনই ঝাঁকুনি দেয়, এর সূঁচগুলো ঢুকে যায় চামড়ার মধ্যে। শরীরটাতেও তখন ঝাঁকুনি সৃষ্টি হয়। শাস্তি কতদূর এগুল, তা বোঝার জন্য হ্যারো তৈরি করা হয়েছে কাচ দিয়ে। কাচের সাথে সূচ ফিট করা একটা টেকনিক্যাল সমস্যা। কিন্তু আমরা যথেষ্ট গবেষণা করে এই সমস্যার সমাধান করেছি। কোনো বাধাই আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত বাধা হয়ে থাকতে পারেনি, বুঝতেই পারছেন। এবং এখন যে কেউ কাচের মধ্য দিয়ে দেখতে পাবে, শোয়ানো লোকটার শরীরে কী লেখা আছে। একটু কাছে সরে এসে আরেকটু মনোযোগ দিয়ে সূচগুলো দেখালে ভালো হত না কি?'

কাছে এসে উবু হয়ে তদন্তকারী হ্যারো পর্যবেক্ষণ করলেন।

'দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই', অফিসার সোৎসাহে বলে চলল, 'দুই ধরনের সূচ সাজানো রয়েছে বিভিন্ন প্যাটার্নে। লম্বা সূচগুলো লেখে আর ছোট সূঁচ থেকে পানির পিচকিরি বেরিয়ে রঙ ধুয়ে ফেলে। যাতে লেখাটা পরিষ্কার বোঝা যায়। রক্ত আর পানি একটা ছোট্ট নালা দিয়ে চলে আসে বড় নালায়, সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে এই গর্তটাতে।' আঙুল দিয়ে অফিসার দেখাল কোন কোন পথ বেয়ে রক্ত আর পানি গর্তে এসে পড়ে। যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য সে দুই হাত একত্রিত করে পাইপের নিচে ধরল গর্তের মতো করে। এসময় তদন্তকারী চেয়ারের দিকে ফিরে চললেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন আসামিটাও অফিসারের মুদ্রায় আকৃষ্ট হয়ে ভালোভাবে দেখার জন্য হ্যারোর কাছে চলে এসেছে। সেপাইটা ঝিমাচ্ছে আর আসামি এগিয়ে এসে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে বেডের উপর। তার বিভ্রান্ত চোখমুখ দেখে বোঝা যায়, এই দুই ভদ্রলোক কী করতে যাচ্ছে তা জানতে খুব

আগ্রহী হলেও সে এখনো ব্যাপারটার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারেনি। তার চোখ বার বার কাচের দিকে যাচ্ছে। তদন্তকারী তাকে সরিয়ে দিতে চাইলেন। কারণ মনে হল, এভাবে দেখাটা আসামির অনুচিত। কিন্তু অফিসার এক হাতের ইশারায় তদন্তকারীকে নিবৃত্ত করে আরেক হাতে একদলা মাটি তুলে ছুঁড়ে মারল সেপাইয়ের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল সেপাই। আচমকা ঘুম ছুটে যাওয়ায় ধারণা করল আসামিটাই তাকে আক্রমণ করেছে। রাইফেল ছেড়ে দিয়ে শেকল ধরে হ্যাঁচকা টান মারল সে। আসামি টলমল করে পড়ে গেল মাটিতে।

'ওকে দাঁড় করাও।' হুকুম করল অফিসার। তদন্তকারীর সম্পূর্ণ মনোযোগ এখন আসামির দিকে, তা সে খেয়াল করেছে। বেখেয়ালে তদন্তকারী হেলান দিতে যাচ্ছেন হ্যারোর গায়ে। তিনি একাগ্রচিত্তে দেখতে চাইছেন এরপরে কী ঘটে আসামির কপালে।

'সাবধানে ধরো ওকে।' চিৎকার করে বলল অফিসার। নিজেই দৌড়ে গিয়ে আসামির কাঁধের নিচে হাত লাগাল। সেপাইয়ের সহযোগিতায় দাঁড় করাল তাকে পায়ের ওপরে। পা দুটো টলমল করছে এখনো।
এবার অফিসার তার কাছে ফিরে আসতেই তদন্তকারী বললেন, 'এখন আমি যন্ত্রটা সম্পর্কে সবটাই জেনে গেছি বোধহয়।'

'প্রায় সবই, তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা বাদে' বলে তদন্তকারীর হাত ধরে উপরের দিকে নির্দেশ করল অফিসার, 'এই যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হয় শাস্তির ধরন অনুসারে। ডিজাইনারের কাঁটাগুলোও। আমি এখনো এক্ষেত্রে আগের কমান্ডান্টের ড্রইংগুলো ব্যবহার করছি। এই যে সেই ড্রইংগুলো'— চামড়ার ওয়ালেট থেকে সে কয়েক টুকরো কাগজ বের করল, 'কিন্তু দুঃখের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এ জন্য যে আমি এগুলো আপনাকে নাড়াচাড়া করতে দিতে পারছি না। এগুলো আমার অমূল্য ধন। আমি আপনার সামনে একটা করে ড্রইং মেলে ধরছি, তাহলেই আপনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন।'

অফিসার প্রথম ড্রইংটা মেলে ধরল তদন্তকারীর সামনে। তিনি ভেবেছিলেন, খুবই প্রশংসার যোগ্য কিছু একটা দেখতে পাবেন কিন্তু আসলে দেখলেন শুধু রেখা টেনে গোলক-ধাঁধাঁ সৃষ্টি করা এক টুকরো কাগজ। অফিসার বলল,'পড়ুন'।

'আমি পড়তে পারছি না।' উত্তর দিলেন তদন্তকারী।

'কেন এটা তো জলের মতো পরিষ্কার, সহজ।'

'কিন্তু আমার তা মনে হচ্ছে না।'

'তাই!' হেসে কাগজটা সরিয়ে নিল অফিসার 'এটা অবশ্য স্কুলের ক্যালিগ্রাফির মতো অতটা সহজ নয়। বুঝতে হলে খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে। আপনিও

চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। এই ড্রইংটা তো সাধারণ কিছু নয়। কোনো লোককে সোজাসুজি মেরে ফেলা খুব সহজ কিন্তু এই যন্ত্রে তেমনটি ঘটা চলবে না। পুরো বারোঘণ্টা ধরেই প্রক্রিয়াটি চলবে। আসল কাজ শুরু হবে যন্ত্র চালু করার ছয় ঘণ্টা পর থেকে। সুতরাং, ড্রইংপ্ল্যান বহুভাবে বিকাশ লাভ করেছে। শাস্তিটা শুধু এক লাইনে লেখা কিন্তু এর অঙ্গসজ্জা আছে বহু। এখন কি আপনি যন্ত্রটার ভেতর প্রশংসার কিছু খুঁজে পেলেন? দেখুন তাহলে?'

মই বেয়ে উঠে একটা চাকা ঘুরিয়ে দিল অফিসার। বলল, 'একপাশে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখুন।'

সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র সচল হল। চাকাটা ভাঙা না হলে খুবই ভালো হত। চাকার প্রচণ্ড শব্দে একটু অবাক হল অফিসার নিজেও, মৃদু ঘুষি মারল চাকায়, তারপর ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল তদন্তকারীর দিকে তাকিয়ে। নেমে এসে নিচ থেকে পরখ করতে লাগল সচল যন্ত্রটাকে। বোঝাই যাচ্ছে, একটা গণ্ডগোল আছে যন্ত্রে। অফিসার আবার উপরে উঠে গেল। ডিজাইনারের মধ্যে দু'হাত ঢুকিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করল কিছু একটা, তারপর মইয়ের হাতল বেয়ে নেমে এল সুরুৎ করে। তারপর ফুসফুসের সব শক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, 'আপনি কি বুঝতে পেরেছেন পদ্ধতিটা? হ্যারো এখন লেখা শুরু করবে। আসামির পিঠে প্রথম ড্রাফটটা শেষ হলেই পুঁতির বেডটা রোল করতে শুরু করবে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও ঘুরবে যাতে হ্যারো লেখার জন্য পাশের জায়গাটি পায়। একই সাথে যে জায়গায় লেখা হয়ে গেছে, তা থেকে রক্ত চুষে নেবে তুলো। ফলে পুরো দেহটা আবার ঘোরার সাথে সাথে আগের লেখাটাকে হ্যারো আবার গভীর করে লিখতে পারবে। এভাবেই পুরো বারো ঘণ্টা ধরে লেখাকে গভীর থেকে গভীরতর করতে থাকবে হ্যারো। আসামি প্রথম ছয়ঘণ্টা থাকবে আগের মতোই সজ্ঞান। সে শুধু ব্যথাই টের পাবে। অবশ্য দু'ঘণ্টা পরেই তার মুখ থেকে গ্যাগ বের করে নেয়া হবে, কারণ তখন তার আর চিৎকার করার ক্ষমতা থাকে না। তখন, এই যে বেডের মাথার কাছে যে বেসিনটা দেখছেন, তার ভেতরে কিছু নরম ভাতের পেস্ট ঢেলে দেয়া হয়। জিভ দিয়ে চেটে চেটে আসামিটা ভাত মুখে নিতে পারে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও কেউ এই খাওয়ার সুযোগটা ছাড়ে না। আমার এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছি— কেউই না। ছয় ঘণ্টা পরে সচরাচর তার খাওয়ার ইচ্ছাটা মরে যায়। আমি সেই সময়ে হাঁটু গেড়ে বসে খেয়াল করি, এরপরে কী ঘটে। সে সময় লোকটা বড়জোর একগাল ভাত মুখে নিতে পারে তবে গিলতে পারে না। ফেলে দেয় গর্তের মধ্যে। সে সময়ে আমি মাথা সরিয়ে নেই। তা নইলে নিশ্চিত সে মুখের ভাত থু করে ফেলতে চাইবে আমার মুখে। কিন্তু ছয়ঘণ্টা পরে সবাই শান্ত হয়ে যায়। বুদ্ধুরাও যেন জ্ঞানী হয়ে ওঠে। আপনি তো দেখেছেন যে ড্রইংগুলোর পাঠোদ্ধার যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু আসামি তখন তার শরীরের অনুভব দিয়ে ঠিকই পাঠোদ্ধার করতে পারে। শেষের ছয়ঘণ্টায়

তার পাঠোদ্ধার আরো নিশ্চিত হয়। তবে হ্যারো ততক্ষণে তার শরীরের গভীরতম অংশে সূঁচ ঢুকিয়ে তাকে কিমা বানিয়ে ফেলে ছুঁড়ে দেয় গর্তের মধ্যে। সে শুয়ে থাকে রক্ত, পানি আর রক্তমাখা তুলোর মধ্যে। আমাদের সুবিচার তখন পরিপূর্ণতা লাভ করে। তারপরে আমি আর সেপাই মিলে লাশটাকে পুঁতে ফেলি।'

তদন্তকারী জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখছিলেন যন্ত্রটাকে কিন্তু তার কান খাড়া অফিসারের কথা শোনার জন্য। বন্দিও যন্ত্রটা দেখছিল কিন্তু বোধহীনভাবে। ঘূর্ণায়মান সূচগুলো তাকে খুবই আকৃষ্ট করেছে। ভালো করে দেখার জন্য আরো সামনে ঝুঁকল সে। ঠিক সেই সময় অফিসার আবছা ইঙ্গিত করতেই সেপাইটা বেয়োনেটের ডগা দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল আসামির পোশাক। পেছন থেকে। পোশাক খসে পড়ছে তার গা থেকে। হতচকিত হয়ে সে কাপড়ের কোনা আঁকড়ে ধরে নিজের নগ্নতা রোধ করার চেষ্টা করল। সেপাই তাকে শূন্যে তুলে ফেলে হ্যাঁচকা টানে খসিয়ে ফেলল পোশাক। অফিসার যন্ত্রের সূচ অফ করে দিল। হঠাৎ নৈঃশব্দ্যে আরো বিহ্বল হয়ে পড়ল বন্দি আর এই ফাঁকে বন্দিকে শুইয়ে দেওয়া হল হ্যারোর নিচে। শেকল দিয়ে বাঁধা হল হাত-পায়ের ফিতেগুলো। হ্যারোটা নামিয়ে আনা হল আরেকটু নিচে। হ্যারোর সূচগুলো চামড়া ছুঁতেই তার শরীর বেয়ে নেমে গেল কাঁপুনির হিমস্রোত। অফিসার লক্ষ করছে তদন্তকারীর মুখভাব। শাস্তিপ্রক্রিয়া তার মনে কেমন ছাপ ফেলছে তা সে বুঝতে চাইছে।

কব্জির ফিতেটা ছিঁড়ে গেল। সম্ভবত সেপাইটা খুব জোরে কষে বাঁধতে গিয়েছিল। সেপাই হাত তুলে অফিসারকে দেখাল ফিতেটা। অফিসার সেদিকে এগুল, যদিও সে এখনো তাকিয়ে আছে তদন্তকারীর দিকে। বলল, 'যন্ত্রটা খুবই জটিল। এখানে-ওখানে কিছু একটি ত্রুটি দেখা দিতেই পারে, কিন্তু তাই বলে শাস্তিপ্রক্রিয়া বন্ধ হবে না। ফিতেটাকে আবার জোড়া দেয়া যাবে।' শেকল বাঁধতে বাঁধতে সে বলে চলল, 'এই যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের বাজেট খুবই কমিয়ে দেয়া হয়েছে। আগের কমান্ডান্টের আমলে অনেক টাকা বরাদ্দ ছিল। সবধরনের স্পেয়ার পার্টসের একটা গুদামও ছিল। আমি স্বীকার করছি, সে সময় যন্ত্রের পিছনে যথেষ্ট ব্যয় করেছি। কিন্তু আমাদের নতুন কমান্ডান্ট সবসময় ছুঁতো খোঁজেন পুরনো নিয়মগুলোর নিন্দা করার। এখন তিনি এই যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের বাজেট নিজের হাতে নিয়েছেন। আমি যদি এখন একটা নতুন ফিতে চেয়ে পাঠাই, তাহলে হুকুম করা হয় পুরাতন ফিতেটা জমা দিতে। নতুন ফিতে আসতে দশ-বারোদিন লেগে যায়। যেটা আসে, সেটাও তেমন উন্নতমানের নয়। এরকম বাজে ফিতে দিয়ে কীভাবে যে আমি যন্ত্রটা চালাব, সে ব্যাপারে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই।'

তদন্তকারী ভাবছিলেন, তিনি তো এই কলোনি বা তার মালিক দেশের নাগরিক নন। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো ভারি অশোভন। তিনি যদি প্রকাশ্যে এই

শাস্তিপ্রক্রিয়ার নিন্দা করেন কিংবা এটা বন্ধ করার চেষ্টা করেন, এবং তখন কেউ যদি বলে বসে যে— এটা আপনার ব্যাপার নয়, নিজের চরকায় তেল দিন— তাহলে তার কিছুই বলার থাকবে না। বরং তিনি বিস্মিত হয়েছেন ব্যাপারটার সাথে জড়িয়ে পড়ায়। তিনি কলোনিতে স্রেফ বেড়াতে এসেছেন। এখানকার লোক কিভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করে, তা দেখা বা পরিবর্তন করতে চাওয়ার কোনো উদ্দেশ্য তার ছিল না। কিন্তু তিনি যথেষ্ট উত্তেজিত হচ্ছেন। এদের অমানবিকতার ব্যাপারটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। যেহেতু আসামি তার পরিচিত নয়, এমনকি তার দেশের মানুষও নয়— কেউই তার মাঝে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পাবে না। তিনি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অনুমতি নিয়ে এখানে এসেছেন। তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েয়ে খুবই সৌজন্যের সাথে এবং এই বিচার ও শাস্তিপ্রক্রিয়া দেখতে বলা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, এ সম্পর্কে তার মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হবে। হতে পারে এ জন্য যে, বর্তমান কমান্ডান্ট এই পদ্ধতি আর সচল রাখতে চান না অথবা এই অফিসারের প্রতি তার বিদ্বেষ রয়েছে।

এই সময় অফিসার চেঁচিয়ে উঠল ক্রোধে। খুব কায়দা-কসরত করে সবেমাত্র বন্দির মুখে গ্যাগটা ঢোকানো হয়েছে, অমনি ওয়াক ওয়াক করে বমি করে ফেলল বন্দি। ত্বরিতে সরে গিয়ে বন্দির মুখটাকে গর্তের দিকে ফেরাতে গেল অফিসার কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। গোটা যন্ত্র মাখামাখি হয়ে গেছে বমিতে।

'সব এই নতুন কমান্ডান্টের দোষে!' চিৎকার করে বলল অফিসার। ক্রোধকম্পিত আঙুল নেড়ে তদন্তকারীকে দেখাল যন্ত্রের নোংরা দশা, 'আমি নতুন কমান্ডান্টকে বারবার বুঝিয়েছি যে, শাস্তি শুরু করার আগে বন্দিকে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা না খাইয়ে রাখতে হবে কিন্তু তিনি কানেই তোলেননি কথাটা। কমান্ডান্টের রক্ষিতাটা এখানে আসার আগে বন্দিকে চিনির ক্যান্ডি খাইয়েছে। যে লোক সারাজীবন খেয়েছে শুধু শুঁটকি মাছ, তাকে দেয়া হল কিনা ক্যান্ডি! এ ব্যাপারটা না-হয় আমি বাদই দিলাম; কিন্তু গত তিনমাস ধরে আমি যে একটা নতুন গ্যাগ চাইছি, তা কেন পাচ্ছি না? এই ফেল্ট গ্যাগ মুখে নিলে একটা মানুষ কি অসুস্থ না-হয়ে পারে, যেখানে শত শত লোক এই গ্যাগ চিবিয়েছে মৃত্যু পর্যন্ত?'

আসামি মাথা নিচু করে শান্তভাবে শুয়ে আছে আর সেপাইটা আসামির জামা দিয়ে যন্ত্রটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। তদন্তকারী একটু সরে দাঁড়িয়েছেন। অফিসার তার কাছে গিয়ে বলল, 'আমি আপনাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। বলার অনুমতি দেবেন কি?'

'অবশ্যই!' বললেন তদন্তকারী।

'শাস্তিদানের এই প্রক্রিয়া, যাকে আপনি প্রশংসা করার সুযোগ পেতে যাচ্ছেন, এই প্রক্রিয়াটা আমাদের কলোনিতে আর বেশিদিন চালু থাকবে কিনা সন্দেহ। এর

পক্ষে একমাত্র সরব মানুষ হচ্ছি আমি। এছাড়া আগের কমান্ডান্টের প্রবর্তিত নিয়মগুলো, যেগুলো আমাদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে, সেগুলোরও একমাত্র সমর্থক আমি। এসব পদ্ধতির যাতে একচুলও নড়চড় না হয়, তার জন্য আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি। আগের কমান্ডান্টের আমলে তার অনুসারীতে কলোনি পরিপূর্ণ ছিল। তার যোগ্যতার কণামাত্রও আমার মধ্যে নেই। সে কারণে অনুসারীরাও সরে পড়েছে। যদিও তারা চায় না যে ঐতিহ্যের অবমাননা করা হোক। আজ যদি আপনি চায়ের আড্ডাগুলোতে যান এবং যদি শোনেন কী বলাবলি হচ্ছে, তাহলে সম্ভবত আপনি এখনকার আমল সম্পর্কে শুধু আজেবাজে মন্তব্যই শুনতে পাবেন। সম্ভবত আমাদের অনুসারীরাই এটা করছেন। কিন্তু বর্তমান কমান্ডান্টের অধীনে তার মতবাদের বিরুদ্ধে সেগুলো কোনো কাজে আসবে না। এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি, এই যন্ত্রটা, যাকে নতুন কমান্ডান্ট এবং তার রক্ষিতারা ভেঙে ফেলতে চায়, তা কি ভাঙতে দেয়া উচিত? বেশি সময় হাতে নেই। আমি যাতে বিচারক হিসেবে আর নিয়োজিত থাকতে না পারি তার চেষ্টা চলছে। এমনকি কমান্ডান্টের মিটিংগুলোতে আমাকে ডাকা হচ্ছে না। আপনার আগমনও আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হচ্ছে। কাপুরুষগুলো আপনাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। আপনাকে— একজন বিদেশি অতিথিকে।'

'আহা, আগে শাস্তিদানের দিনটি কত সুন্দর ছিল! চব্বিশঘণ্টা আগেই উপত্যকা পরিপূর্ণ হয়ে যেত মানুষের ভিড়ে। খুব ভোরে কমান্ডান্ট তার রক্ষিতাদের নিয়ে চলে আসতেন। বিউগলের শব্দে মুখর হয়ে উঠত উপত্যকা। আমি রিপোর্ট করতাম। কোনো বড় অফিসার সাহস পেত না অনুপস্থিত থাকার। সবাই জড়ো হতেন যন্ত্রের চারপাশে। যন্ত্রটা পরিষ্কার, ঝকঝকে। প্রায় প্রত্যেক দিন আমি নতুন স্পেয়ার পার্টস পেতাম। শত শত দর্শকের সামনে কমান্ডান্ট নিজে আসামিকে শুইয়ে দিতেন হ্যারোর নিচে। এখন একটা সাধারণ সৈনিক যে কাজটা করে, তখন সেটা ছিল আমার ডিউটি। তখন শুরু হত শাস্তির প্রক্রিয়া! যন্ত্র থেকে কোনো শ্রুতিকটু শব্দ বেরুত না কখনোই। অনেকেই দেখতে চাইত না, কিন্তু তাদেরও দাঁড়িয়ে থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। তারা প্রত্যেকেই জানত, আইন নিজস্ব গতিতে চলছে। চারদিক নিঃশব্দ, শুধু আসামির গলার ঘর্ঘর শব্দ ছাড়া। এখন তো ফেল্ট গ্যাগ চিবানোর শব্দই শোনা যায় না। কিন্তু তখন সূচ ফোটানোর পরে আসামির গায়ে ঢেলে দেয়া হত এসিড। চিৎকার ছিল শোনার মতো। এখন আর এসিড দেয়া হয় না। তারপরে যখন ষষ্ঠ ঘণ্টা আসত! সবাই অনুরোধ করত, তাকে আরো কাছ থেকে দেখার অনুমতি দেয়া হোক। আমাদের সুবিবেচক কমান্ডান্ট আদেশ দিয়েছিলেন যে, কাছ থেকে দেখার ব্যাপারে শিশুরা অগ্রাধিকার পাবে। আমি অবশ্য দায়িত্বের কারণেই সুযোগটা বেশি পেতাম। কোনো কোনোদিন দুই কাঁধে দুই শিশু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আসামির শাস্তি দেখে আমাদের মুখ নিজেদের অজান্তেই উজ্জ্বল

হয়ে উঠত। আহ্! আমাদের মহান আইন তার নিজস্ব গতিতে কাজ করে চলেছে! কত তাড়াতাড়ি সবকিছু বিবর্ণ হয়ে গেল। কী যে দিন ছিল সেগুলো কমরেড!' সম্বোধন ভুলে অফিসার ভাবের ঘোরে মাথা এলিয়ে দিল তদন্তকারীর কাঁধে!

খুবই বিরক্ত হলেন তদন্তকারী। অফিসারের মাথার উপর দিয়ে দেখলেন, সেপাই যন্ত্র পরিষ্কার করে বেসিনে একবাটি গলাভাত ঢেলে দিচ্ছে। সাথে সাথে আসামি তার জিভ এগিয়ে দিল ভাতের নাগাল পাবার জন্য। কিন্তু সেপাই তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল; এতক্ষণে মনে পড়েছে যে, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সে ভাত ঢেলে দিয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ নিজের নোংরা হাত দিয়ে বেসিন থেকে ভাত তুলে খেতে শুরু করল আসামির ব্যগ্র চোখের সামনে।

অফিসার মাথা তুলে বলল, 'আমি আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না। আমি জানি আগের দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। কিন্তু যন্ত্রটা এখনো চালু, এখনো এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে সক্ষম। এটাকে উপত্যকায় ফেলে রাখলেও একাকী কাজ করতে পারবে এবং দণ্ডপ্রাপ্তকে শেষ পর্যন্ত ঠিকই ছুঁড়ে ফেলতে পারবে গর্তের মধ্যে। যদিও আগের সেই ভনভনে মাছির মতো দর্শকের ভিড় হবে না। জানেন, আগে আমি গর্তের চারদিকে শক্ত বেড়া দিতে বাধ্য হতাম ভিড় সামলাতে।'

তদন্তকারী অফিসারের চোখে চোখ রাখা এড়াতে চাইছিলেন। চোখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছিলেন এদিক-ওদিক। অফিসার ভাবল, তিনি বোধহয় উপত্যকার রুক্ষতা দেখছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই আমাদের লজ্জাটা অনুভব করতে পারছেন?'

কিন্তু তদন্তকারী কোনো উত্তর দিলেন না। অফিসার দু'পা ফাঁক করে, কোমরে দুহাত রেখে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে রইল মাটির দিকে। তারপর তদন্তকারীর দিকে আশ্বাসের হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'গতকাল কমান্ডান্ট যখন আপনাকে আমন্ত্রণ জানান, আমি তখন পাশেই ছিলাম। আমি নিজ কানে শুনেছি। আমি কমান্ডান্টকে চিনি। তার উদ্দেশ্যও আমার জানা। যদিও আমার বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা তার আছে। তবু তিনি তার ক্ষমতা ব্যবহার করবেন না। কিন্তু তিনি আপনার মতামতকে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চান। কারণ, মতামতটা একজন সম্মানিত বিদেশি অতিথির। তিনি খুব হিসাব করে ফাঁদ পেতেছেন। কারণ, আজ মাত্র দুইদিন হল আপনি এই কলোনিতে এসেছেন, আগের কমান্ডান্ট সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাছাড়া আপনি পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক চিন্তায় অভ্যস্ত। আপনার নিশ্চয়ই মনে হবে, এভাবে শাস্তি প্রদানে কোনো জনসমর্থন নেই। কারণ উপত্যকা দর্শকশূন্য, যন্ত্রটাও পুরনো হয়ে গেছে। এসব বিবেচনা করে কমান্ডান্ট ভাবছেন আপনি নিশ্চয়ই এই পদ্ধতি অপছন্দ করবেন। আর নিশ্চয়ই আপনার অপছন্দ আপনি গোপন করবেন না (কমান্ডান্টের

দৃষ্টিতেই আমি ব্যাপারটা বোঝাচ্ছি), কারণ আপনার মতো অভিজাত মানুষরা নিজেদের সিদ্ধান্ত গোপন করেন না। সত্যি বটে, এই পদ্ধতিটা আপনি, আপনার দেশে প্রয়োগ করতে চাইবেন না। আমিও নিজের দেশে চাইব না। কিন্তু কমান্ডান্টের তা জানার দরকার নেই। সাধারণ একটা অসতর্ক মন্তব্যই তার জন্য যথেষ্ট। আপনার চিন্তাধারা কী, সেটাও তার জানা দরকার পড়বে না। আপনার মন্তব্যকে তিনি ব্যবহার করবেন স্রেফ নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। আমি নিশ্চিত জানি, চতুর প্রশ্ন করে তিনি আপনাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করবেন। তার রক্ষিতারা আপনাকে ঘিরে বসে কান খাড়া করে রাখবে। আপনি হয়তো শুধুমাত্র বলবেন— আমাদের দেশে বিচারপদ্ধতি ভিন্নরকম। কিংবা— আমাদের দেশে শাস্তিদানের পূর্বে আসামিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। কিংবা হয়তো বলবেন— আমরা অনেকদিন আগে নির্যাতন বন্ধ করে দিয়েছি। এ সমস্ত মন্তব্যের কোনোটাই আমাদের পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ করে না। কিন্তু কমান্ডান্টের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কী ঘটবে। আমাদের কমান্ডান্ট চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ব্যালকনির দিকে ছুটবেন, তার পিছে পিছে শোরগোল তুলে ছুটবে রক্ষিতার দল। তিনি চিৎকার করে বলতে শুরু করবেন— পাশ্চাত্যের একজন বিখ্যাত তদন্তকারী, সারা পৃথিবীর বিচারপদ্ধতি জানতে যিনি দেশে দেশে ঘুরেছেন— তিনি এইমাত্র বললেন যে আমাদের বিচারপদ্ধতি অমানবিক। এমন একজন ব্যক্তিত্ব যে পদ্ধতিকে অমানবিক বলেছেন, সেই পদ্ধতি চালু রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং আমি আদেশ করছি, আগামী অমুক তারিখ থেকে... অর্থাৎ এভাবেই ব্যাপারটা ঘটবে। আপনি হয়তো বলতে চাইবেন যে, আপনি কখনোই আমাদের বিচারপদ্ধতিকে অমানবিক বলেননি, বরং আপনার বিশাল অভিজ্ঞতার কারণে বুঝতে পেরেছেন যে, এই পদ্ধতিটা মানুষের জন্য সম্মানকর, আপনি আমাদের পদ্ধতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন— কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আপনি রক্ষিতাদের ভিড়ে ব্যালকনিতে দাঁড়াবার জায়গাই পাবেন না। আপনি চিৎকার করতে চাইলে কোনো এক রক্ষিতা আপনার ঠোঁট চেপে ধরবে— এবং আমার ও আগের কমান্ডান্টের ঐতিহ্যের সেখানেই সমাপ্তি।'

তদন্তকারী বহু কষ্টে হাসি গোপন করলেন। বললেন, 'আপনি অযথা আমাকে বেশি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাবছেন। কমান্ডান্ট জানেন যে আমি বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে কোনো বিশেষজ্ঞ নই। যদি আমি কোনো মতামত দিতে যাই, তবে তা হবে একজন সাধারণ মানুষের মতামতেরই সমতুল্য। কমান্ডান্ট এই কলোনির সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর নিজস্ব মতামতের গুরুত্ব অসীম। আপনার পদ্ধতির প্রতি যদি তিনি বিরূপ হয়ে থাকেন, তবে আমি নিশ্চিত, তার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহযোগিতা ছাড়াই, আপনার ঐতিহ্য শেষ হতে যাচ্ছে অচিরেই।'

কথাগুলো কি অফিসারের বোধোদয় ঘটাল? না, সে কিছুই বুঝতে পারেনি। সে প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকাল, চোখ বুলাল আসামি আর সেপাইটির দিকে, তারপর তদন্তকারীর কাছাকাছি এসে তার মুখের দিকে না-তাকিয়ে চেয়ে রইল কোটের বোতামের দিকে। নিচু গলায় বলল, 'আপনি কমান্ডান্টকে চেনেন না। আপনি যেভাবে সাধারণ একজন বহিরাগত হিসেবে নিজেকে জাহির করছেন, আপনি ততটা সাধারণ নন। আপনার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমার কোনো ভুল ধারণা নেই। আপনি নিজে থেকে আজকের শাস্তিপ্রক্রিয়া দেখতে চাওয়ায় আমি খুশি হয়েছি। কমান্ডান্ট এটা করেছেন আমার প্রতি একটা আঘাতের আয়োজন হিসেবে। কিন্তু আমি এটাকে পরিণত করব আমার স্বপক্ষশক্তিতে। আজেবাজে ফিসফিসানিতে বিভ্রান্ত না হয়ে এটা তো আর অস্বীকার করা যাবে না যে, আগে এই শাস্তিপ্রদান অনুষ্ঠান দেখতে প্রচুর লোক সমাগম হত— আপনি আমার বক্তব্য শুনেছেন, যন্ত্রটা দেখছেন, এখন দেখছেন শাস্তিপ্রদান। এখনো কোনো প্রশ্ন যদি আপনার মনে থাকে, শাস্তিপ্রক্রিয়া পুরোপুরি দেখলে সেসবেরও উত্তর আপনাআপনি পেয়ে যাবেন। এখন আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, কমান্ডান্টের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন!'

তদন্তকারী তাকে থামিয়ে দিলেন, 'আমি কীভাবে তা করতে পারি? আমার পক্ষে আপনাকে সাহায্য করাও যেমন অসম্ভব, আপনার বিরোধিতা করাও অসম্ভব।'

'পারেন, আপনি অবশ্যই পারেন!' অফিসারের হাত মুষ্টিবদ্ধ হল, 'আপনি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করতে পারেন।' আবার সে বলল, 'আমি একটা প্ল্যান তৈরি করেছি। সফল হতে বাধ্য। আপনি মনে করছেন আপনার গুরুত্ব কম। আমি মনে করি আপনার গুরুত্ব যথেষ্ট। যদি আপনার কথাই সত্যি হয়, তবুও কি আমাদের উচিত নয় ঐতিহ্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা? এবার আমার প্ল্যান শুনুন। আমাদের এই পদ্ধতি নিয়ে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে আপনি যতটা সম্ভব মৌন থাকার চেষ্টা করবেন। আপনাকে সরাসরি জিগ্যেস না করা পর্যন্ত কিছুই বলবেন না। কিংবা বলবেন, খুব সংক্ষেপে। অন্যেরা যাতে ভাবে আপনি এই ব্যাপারে আলোচনা করতে অনিচ্ছুক। আমি আপনাকে কোনো মিথ্যা কথা বলতে বলছি না। আপনার কথাগুলো হবে কাটাকাটা। যেমন— আমি শাস্তিপ্রদান প্রক্রিয়া দেখেছি। বা— আমার কাছে সমস্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর বেশি না। আপনার নীরবতা কমান্ডান্টকে উদ্বিগ্ন করে তুলবে। সে নিজের মতো করে আপনার কথার মানে করার চেষ্টা করবে। আর এর ওপরই নির্ভর করছে আমার প্ল্যান। আগামীকাল কমান্ডান্টের অফিসে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটা বড় মিটিং হবে। কমান্ডান্ট চাইবেন এই মিটিং জনসমক্ষে হোক। তিনি দর্শকদের জন্য একটা গ্যালারি তৈরি করেছেন, যা সবসময়ই পরিপূর্ণ থাকে। আমি এই ধরনের সভায় যেতে বাধ্য হই কিন্তু তারা আমাকে আজেবাজে প্রশ্ন করে অসুস্থ করে তোলে।

এখন, যাই ঘটুক, আপনাকে অবশ্যই আমন্ত্রণ জানানো হবে। বিশেষ করে, আমি যা বললাম আপনি যদি সেই মতো আচরণ করেন, তবে তো আপনাকে খুব জরুরিভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যদি কোনো রহস্যময় কারণে আমন্ত্রণ না আসে, তাহলে আপনি নিজেই আমন্ত্রণ চাইবেন। নিঃসন্দেহে আপনার অনুরোধ গ্রাহ্য করা হবে। অর্থাৎ আপনি আগামীকাল কমান্ডান্টের পাশে তার রক্ষিতাদের সাথে বসছেন। তিনিই নিশ্চিত করবেন, যাতে আপনি সেখানে থাকেন। আলোচনা চলবে নগণ্য ও হাস্যকর বিষয় নিয়ে। সেগুলো আসলে পাবলিককে ভোলানোর জন্য। দর্শকদের বেশিরভাগই বন্দরের খালাসি। আমাদের বিচারপ্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা হবে। আলোচনার শুরুতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে জানাব যে, আজকের শাস্তিপ্রদানের আদেশটি পালিত হয়েছে। শুধু একটা বিবৃতি। কমান্ডান্ট আমাকে ধন্যবাদ জানাবেন বিরক্তির সাথে। তারপরেই তিনি আর নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারবেন না। তিনি বলতে থাকবেন— গতকাল একটা শাস্তিপ্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে এমন একজন অতিথি উপস্থিত ছিলেন, যিনি ভ্রমণের দ্বারা আমাদের কলোনিকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। আমরা কি আমাদের ঐতিহ্যবাহী বিচার ও শাস্তিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে তার মতামত আশা করতে পারি না? সবাই সমস্বরে তার কথা সমর্থন করবে। আমি করব সবচেয়ে জোরে। তখন কমান্ডান্ট আপনাকে বলতে বলবেন। আপনি উঠে এসে বক্সের কাছে দাঁড়াবেন। হাত দুটো রাখবেন এমনভাবে যাতে সবাই দেখতে পায়। নইলে রক্ষিতারা আপনার হাতে নিয়ে কচলাতে থাকবে। আমি জানি না, কীভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার উত্তেজনা চেপে রাখতে পারব। আপনি কিন্তু কোনো টেনশনে থাকবেন না। স্থির নিষ্কম্প গলায় চিৎকার করে আপনার মতামত জানাবেন। এভাবে যদি না-জানাতে পারেন, হয়তো এভাবে কথা বলা আপনার দেশের রেওয়াজ নয়, তাহলে চেয়ার ছেড়ে ওঠার দরকার নেই। আপনি নিচুস্বরে আপনার মতামত জানাবেন, যাতে আপনার ঠিক নিচের সারিতে বসা অফিসাররা শুধু শুনতে পান। তাতেই যথেষ্ট হবে। এমনকি আপনাকে এই শাস্তিপ্রক্রিয়ায় জনগণের সমর্থনের কথাও বলতে হবে না। যন্ত্রের ভাঙা চাকা, ছেঁড়া ফিতে, জীর্ণ ফেল্ট গ্যাগ— এগুলো সম্পর্কেও না। এগুলো আমি নিজের কাঁধে নেব। এবং বিশ্বাস করুন, আমার অভিযোগের তোড়ে কমান্ডান্ট যদি হল ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে বাধ্য না-ও হন, তবু তাকে হাঁটু মুড়ে হাত জোড় করে বলতে হবে— আমার ভূতপূর্ব কমান্ডান্ট, আমি আপনার তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট, তুচ্ছ! এটাই আমার প্ল্যান। এর বাস্তবায়নে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না? অবশ্যই করবেন। করতেই হবে!'

তদন্তকারীর দুই বাহু চেপে ধরে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অফিসার। তার ঝড়ো নিশ্বাস পড়ছে তদন্তকারীর মুখে। শেষ বাক্যটা সে এমন চিৎকার করে বলল যে, আসামি এবং সেপাই ভয়ে কেঁপে উঠল। তারা এসব কথার একবর্ণও বুঝতে পারেনি, তবু খাওয়া থামিয়ে তাকিয়ে রইল তদন্তকারী ও অফিসারের দিকে।

তার উত্তর কী হবে সে ব্যাপারে প্রথম থেকেই তদন্তকারীর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। তার অভিজ্ঞতা অনেক। তিনি সত্যি সত্যিই অভিজাত ও সম্মানিত মানুষ। তবুও একটু ইতস্তত করলেন। সেপাই আর আসামির দিকে একবার তাকালেন। তারপর সেই শব্দটি বললেন যা তিনি বলবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন— 'না!'

অফিসার কয়েকবার চোখ পিটপিট করল। তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তিনি জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কি চান যে আমি কারণটা ব্যাখ্যা করি?'

অফিসার কোনো কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল।

তদন্তকারী বললেন, 'আমি আপনার পদ্ধতি সমর্থন করি না। যদিও আপনি আমাকে আপনার বিশ্বাসের সঙ্গী ভাবছেন— অবশ্যই আমি আপনাকে আপনার বিশ্বাস থেকে সরতে বলতে পারি না— আমি ভাবছিলাম কীভাবে ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করা যায়। অন্তত কীভাবে একাজে বাধা দেওয়া সম্ভব হবে। আমি বুঝতে পারছি, আমাকে কার কাছে যেতে হবে। অবশ্যই নতুন কমান্ডান্টের কাছে। আপনার বিশ্বাসের দৃঢ়তা আমাকে স্পর্শ করেছে, তবে আমার বিচার-বুদ্ধির ওপর তা কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি।'

অফিসার নিশ্চুপ। ধীরে ধীরে ঘুরে সে যন্ত্রের কাছে দাঁড়াল, হাতে চেপে ধরল একটা পেতলের রড। পেছনে হেলান দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডিজাইনারের দিকে। সেপাই আর আসামির মধ্যে মনে হল একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে। আসামি ফিতে বাঁধা অবস্থাতেই কষ্টে-সৃষ্টে ইঙ্গিত করল সেপাইকে। সেপাই এসে নিচু হয়ে দাঁড়াল তার পাশে। আসামি ফিসফিসিয়ে কিছু বলল সেপাইকে। তার কথা শুনে সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকাল সেপাই।

তদন্তকারী কিছুক্ষণ লক্ষ করলেন অফিসারকে। বললেন, 'আপনি জানেন না আমি কী ভাবে কাজটা করতে চাইছি। এই বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার মতামত আমি অবশ্যই কমান্ডান্টকে বলব। তবে তা কোনো পাবলিক মিটিং-এ নয়। আমি তাকে জানাব একাকী। তাছাড়া কোনো সভা হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে থাকছিও না। আমি আগামীকাল খুব ভোরে আমার জাহাজ ভিড়লেই এই কলোনি ছেড়ে চলে যাব।'

অফিসার কথাগুলো শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। 'তাহলে আমাদের বিচারপদ্ধতি উপযুক্ত নয়'— বিড়বিড় করে একথা বলে হাসল সে; যেভাবে কোনো জ্ঞানী বৃদ্ধ হাসে বালকোচিত অজ্ঞতা দেখে। তার হাসির পেছনে লুকিয়েছিল তার বিশ্বাসের দৃঢ়তা।

'সময় এসেছে।'

এ-কথা বলে সে খুব উজ্জ্বল চোখে চাইল তদন্তকারীর দিকে। দৃষ্টিতে মেশানো

আছে কিছুটা চ্যালেঞ্জ, কিছুটা সহযোগিতার আর্তি।

'কিসের সময়?' অস্বস্তিভরে জিগ্যেস করলেন তদন্তকারী। কিন্তু কোনো উত্তর পেলেন না।

'তুমি মুক্ত!' অফিসার নেটিভ ভাষায় বলল আসামিকে।

লোকটা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারল না একথা।

'হ্যাঁ, তুমি এখন মুক্ত।' আবার বলল অফিসার।

প্রথমবারের মতো আসামির মুখে ফুটে উঠল জন্তুসুলভ অভিব্যক্তি। একি সত্যি? নাকি এটা অফিসারের হঠাৎ মত পরিবর্তন, যা আবার পরিবর্তিত হয়ে যাবে? বিদেশি তদন্তকারী কি তার মুক্তি চেয়েছেন? আসলে ব্যাপারটা কী? যে কেউ তার মুখে ফুটে ওঠা চিহ্নগুলো পড়তে পারবে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। ঘটনা যাই হোক-না কেন, সে সত্যি সত্যি মুক্তি পেতে চায়। ফিতে-বাঁধা হাত-পা টানাটানি শুরু করল সে।

'আরে আরে ফিতেগুলো ছিঁড়ে যাবে যে!' কঁকিয়ে উঠল অফিসার, 'চুপচাপ শুয়ে থাক, আমরা তোমার বাঁধন খুলে দিচ্ছি।'

সেপাইকে ইঙ্গিত করতেই সে এসে শুরু করল বাঁধন খুলতে। আসামি হাসতে লাগল আনন্দে। বার বার সে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে অফিসারের দিকে, তদন্তকারীর দিকে আর হাসছে। হ্যারোটা প্রায় গায়ের সাথে লেগে আছে। তাকে তাই বাঁধন খোলার পরে নামাতে হবে খুব সাবধানে। তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে তার পিঠের চামড়া ছিলে গেল কয়েক জায়গায়। কিন্তু সেদিকে লক্ষই নেই আসামির।

আসামির দিকে আর মনোযোগ নেই অফিসারের। সে তদন্তকারীর কাছে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে আবার বের করল চামড়ার ওয়ালেটটা। কাগজের টুকরোগুলো বের করে বেছে নিল একটা ড্রইং, যেটা সে খুঁজছিল। তদন্তকারীকে দেখিয়ে বলল, 'পড়ুন।'

'আমি পারি না', তদন্তকারী বললেন, 'আমি তো আপনাকের আগেই বলেছি যে এই নকশার পাঠোদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'খুব কাছ থেকে একবার চেষ্টা করুন।' বলে অফিসার তদন্তকারীর কাছে ঘেঁষে এল, যেন দু'জনে মিলে পড়তে পারে। কিন্তু এভাবেও যখন কাজ হল না, সে তখন কড়ে আঙুল দিয়ে লেখাটি বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করল। তদন্তকারী সর্বশক্তিতে চেষ্টা করলেন অফিসারকে একটু হলেও খুশি করার ইচ্ছায়, কিন্তু পারলেন না পড়তে। অফিসার তখন বানান করতে শুরু করল একটা একটা অক্ষর ধরে। তারপরে পড়ল— 'বিশ্বস্ত হও।'

'আপনি এখন নিশ্চয় পড়তে পারছেন?'

তদন্তকারী এতটাই ঝুঁকে পড়লেন ড্রইংগুলো উপর যে অফিসারের ভয় হল, হয়তো তিনি ড্রইংটা ছুঁয়ে ফেলবেন। সে তাই কাগজটা খানিক সরিয়ে নিল। তদন্তকারী কোনো মন্তব্য করলেন না। তবে পরিষ্কার বোঝা গেল ড্রইং-এর পাঠোদ্ধার তিনি আদৌ করতে পারেননি।

অফিসার আবার বলল, 'এখানে লেখা আছে,— বিশ্বস্ত হও!'

'হতে পারে।' তদন্তকারী বললেন, 'আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত।'

'আচ্ছা বেশ।' অফিসারকে আংশিক সন্তুষ্ট দেখাল। মই বেয়ে সে উপরে উঠে গেল কাগজটা হাতে নিয়ে। ডিজাইনারের ভিতর রাখল খুব যত্ন করে। এ কাজটা খুবই কষ্টকর, কারণ ছোট-বড় সব চাকাই এ্যাডজাস্ট করতে হয়। খুব যত্নের সাথে কাজটা করল অফিসার। তদন্তকারী মাথা উঁচিয়ে অফিসারের কাজ দেখছিলেন। তার কাঁধ ব্যথা হয়ে গেল।

সূর্যের তাপে তার চোখ ঝলসে যাচ্ছিল। সেপাই ও আসামি তখন অন্য কাজে ব্যস্ত। আসামির ছেঁড়া প্যান্ট-শার্ট ইতোমধ্যেই গর্তে ফেলে দেয়া হয়েছিল। বড়শিতে মাছ গেঁথে তোলার মতো করে সেপাইয়ের বেয়োনেট দিয়ে সেগুলো তোলা হল। জামাটা শোচনীয় ভাবে নোংরা। জামার মালিক সেটা বালতির পানি দিয়ে ধুয়ে নিল। জামা-প্যান্ট পরা শেষ হতেই সে এবং সেপাই দুজনেই উচ্চস্বরে হেসে উঠল, কারণ জামা ও প্যান্ট দুটোই পেছন দিকে লম্বালম্বি ফাঁড়া। সম্ভবত আসামি ভাবল, সেপাইকে হাসানো তার কর্তব্য। তাই সে ঘুরে ঘুরে পেছনটা দেখাতে লাগল সেপাইকে, আর সেপাই হাসতে হাসতে মাটিতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। সম্ভবত ভদ্রলোক দুজনের খাতিরেই তারা এই পর্যন্তই সীমিত রাখল তাদের উল্লাস।

অফিসার উপরের কাজ শেষ করে আবার খুঁটিয়ে দেখল যন্ত্রপাতি। এরপর সে ডিজাইনের হুক আটকে দিল যা এতক্ষণ খোলা ছিল। ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে সে নেমে এল মই বেয়ে, তাকাল গর্তটার দিকে। আসামির উচ্ছ্বাস দেখল হাসিমুখে, তারপর হাত ধুয়ে ফেলল বালতির পানিতে। পানি ইতোমধ্যেই প্রচণ্ড নোংরা হয়ে আছে, তাই হাত পরিষ্কার হবার প্রশ্নই ওঠে না। সে তখন বালতিতে হাত ঘষল। এই বিকল্প পথও খুব একটা কার্যকর মনে হল না। তবুও সেটা মেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল অফিসার। তারপর খুলতে শুরু করল নিজের পোশাক। গলা থেকে রুমাল খুলে ছুঁড়ে দিল আসামির দিকে— 'এই যে তোমার রুমাল।' তদন্তকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কমান্ডান্টের রক্ষিতাদের পক্ষ থেকে পাঠানো উপহার!'

যদিও সে খুব দ্রুতহাতে নিজের পোশাক খুলছিল, তবুও তাতে ছিল যত্নের ছোঁয়া। এমনকি সে তার মেডাল আর ফিতেগুলোর ওপর হাত বোলাল একবার খুবই যত্নের সাথে। কাপড়গুলো খুলে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলল গর্তের মধ্যে। বাকি রইল শুধু তার

ছোট তলোয়ার আর খাপ। এবার সে খাপ থেকে টেনে বের করল তলোয়ারটা, তারপর সেটাকে এত জোরে গর্তে ছুঁড়ে মারল যে সেটা ঘ্যাচ করে ঢুকে গেল গর্তের তলায়।

সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সটান। সম্পূর্ণ নগ্ন। ঠোঁট কামড়ে ধরে নিশ্চুপ থাকলেন তদন্তকারী। তিনি ভালোমতেই বুঝতে পেরেছেন কী ঘটতে চলেছে। কিন্তু অফিসারকে কোনো কিছুতেই বাধা দেবার অধিকার তার নেই। যে বিচারপদ্ধতিকে এতদিন লালন করে এসেছে অফিসার, তা যখন আজ বন্ধ হবার পথে— সম্ভবত তার নিজের হস্তক্ষেপের কারণে, যা রক্ষা করতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল— তখন অফিসার ঠিক কাজটাই করছে। তার জায়গায় থাকলে তদন্তকারীও হয়তো এর অন্যথা করতেন না।

সেপাই আর আসামি প্রথমদিকে বুঝতে পারেনি কী ঘটতে চলেছে। প্রথমদিকে তারা খেয়ালই করেনি। আসামি রুমাল দুটো পেয়ে খুব খুশি। কিন্তু তার আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হল না কারণ হঠাৎ এক হ্যাঁচকা টানে সেপাই রুমাল দুটো ছিনিয়ে নিল। রুমাল ফিরে পাওয়ার জন্য আসামি আঁকড়ে ধরতে গেল সেপাইকে। শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি। এটাও বেশ মজার। কিন্তু অফিসার সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়ানোর পরেই তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হল সেদিকে। আসামি কীভাবে যেন বুঝে ফেলেছে, একটা বিরাট পরিবর্তন আসন্ন। যা তার ভাগ্যে ঘটতে যাচ্ছিল, তা ঘটতে চলেছে অফিসারের ক্ষেত্রে। তার মনে হল বিদেশি তদন্তকারী এই আদেশ করেছেন। সুতরাং এটা তার প্রতিশোধের মওকা। যদিও তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ঘটেনি, তবু সে চায় অফিসারকে পূর্ণ শাস্তি দেওয়া হোক। তার মুখে ফুটে উঠল চওড়া হাসি।

অফিসার এগিয়ে গেল যন্ত্রের দিকে। আগেই জানা ছিল সে যন্ত্রটাকে ভালোভাবে বুঝতে পারে। কিন্তু এখন দেখার বিষয় হচ্ছে সে কীভাবে এটাকে ম্যানেজ করে। সে হাত দিয়ে হ্যারো এ্যাডজাস্ট করল। বেড-এর প্রান্ত স্পর্শ করতেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝাঁকুনি দিতে শুরু করল। ফেল্ট গ্যাগ এগিয়ে এল তার মুখের দিকে। যে কেউ দেখলেই বুঝত যে অফিসার এই গ্যাগ নিতে স্পষ্টতই অনিচ্ছুক। কিন্তু মাত্র এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে গ্যাগটা মুখের মধ্যে গ্রহণ করল। সবই ঠিক আছে, শুধু ফিতেগুলো বাঁধা হয়নি। আসলে সেগুলো বাঁধার কোনো দরকার নেই। কিন্তু তখনই নজর পড়ল ফিতেগুলোর দিকে। তার ধারণা ফিতেগুলো না-বাঁধলে পুরো প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে ব্যগ্র হয়ে সেপাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেদিকে আর দুজন ছুটে গেল অফিসারকে ফিতে দিয়ে বাঁধতে। অফিসার একটা পা উঁচু করেছিল ডিজাইনার-এর হাতলে ঠেলা দিয়ে সেটাকে চালু করার জন্য। এদের দুজনকে আসতে দেখে সে পা নামিয়ে নিল। তার হাত-পা বেঁধে ফেলল দুজনে। এখন সে আর হাতল ছুঁতে পারবে না। আসামি আর সৈনিক যন্ত্রটা চালাতে জানে না। আর তদন্তকারী ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তিনি একটা

আঙুলও নাড়াবেন না। তার অবশ্য দরকারও হল না। ফিতে বাঁধার সাথে সাথে যন্ত্র নিজে থেকেই কাজ শুরু করল। বেড-এ ঝাঁকুনি চলছে, সূচগুলো বেরিয়ে এসেছে এবং হ্যারো ওঠা-নামা শুরু করেছে। তদন্তকারীর মনে পড়ল একটা ভাঙা চাকা থেকে শব্দ বেরুনোর কথা। কিন্তু কোনো শব্দ বেরুল না, এমনকি মৃদু ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দও না।

মসৃণভাবে কাজ করছে বলেই যন্ত্রটার ওপর থেকে মনোযোগ সরে গেল তার। তদন্তকারী তাকালেন সেপাই এবং আসামির দিকে। শেষোক্তজন বেশি বন্য। যন্ত্রের সবকিছুই তার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। একবার সে বেঁকে দাঁড়াচ্ছে, পর মুহূর্তেই পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হচ্ছে, আর তর্জনী উঁচিয়ে সেপাইকে দেখাচ্ছে যন্ত্রের কাজ। তদন্তকারী বিরক্ত হলেন। তিনি শেষপর্যন্ত এখানে থাকতে চান, কিন্তু এই দুজনকে তার অসহ্য লাগছে। তিনি আদেশ করলেন, 'ঘরে ফিরে যাও।' ঘরে ফিরে যাবার ইচ্ছা সেপাইটার যথেষ্ট, কিন্তু আসামির কাছে আদেশটা শাস্তি বলে মনে হল। সে হাত জোড় করে থাকার অনুমতি চাইল। কিন্তু তাতেও তদন্তকারীর মন গলল না। শেষে সে হাঁটু গেড়ে বসল করুণ ভঙ্গিতে। তদন্তকারী দেখলেন শুধু মৌখিক আদেশে কাজ হচ্ছে না, তিনি এদের তাড়িয়ে দিতে মনস্থ করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার কানে এল ডিজাইনার থেকে বেরুনো একটা বিশ্রী কর্কশ শব্দ। তিনি উপরের দিকে তাকালেন। ভাঙা চাকাটা কি কাজে বিঘ্ন ঘটানো শুরু করল? কিন্তু মনে হল ব্যাপারটা অন্যরকম। খুব ধীরে ধীরে ডিজাইনার উপরে উঠে গেল আর পুরোপুরি খুলে গেল তার মুখ। চাকার সূচালো দাঁতগুলো পরিষ্কার দেখা গেল। একটু পরেই দেখা গেল পুরো চক্রটা। মনে হচ্ছে একটা বিশাল শক্তি চাপ দিচ্ছে ডিজাইনারকে, ফলে চক্রটাকে ভেতরে আর জায়গা দিতে পারছে না ডিজাইনার । চক্রটা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় চক্র দেখা গেল। একটু পরেই দেখা গেল ঘুরে চলেছে অসংখ্য চক্র। একটা চক্র বেরিয়ে আসতেই মনে হচ্ছে ডিজাইনার এখন শূন্য, কিন্তু পরক্ষণেই বেরিয়ে আসছে আরেকটা চক্র। এই দৃশ্য দেখে আসামি ও সেপাই বেমালুম ভুলে গেল তদন্তকারীর আদেশ।

তদন্তকারী প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যন্ত্রটা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। তিনি অনুভব করলেন এখন অফিসারকে সাহায্য করা দরকার। কিন্তু গোত্তা খেতে থাকা চক্রগুলো তার মনোযোগ কেড়ে রাখায় এতক্ষণ তিনি যন্ত্রের অন্য অংশের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন। শেষ চক্রটি ডিজাইনার ছেড়ে বেরিয়ে এল। হ্যারোর দিকে তাকাতেই দেখলেন আরেকটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে। হ্যারো লিখছে না, শুধু আঘাত করে চলেছে। বেড ঘুরছে না, বার বার দেহটাকে তুলে আনছে সূচের কাছে। তদন্তকারী যন্ত্রটাকে বন্ধ করতে চাইলেন, কারণ অফিসার যেভাবে বলেছিল সেভাবে ঘটছে না কিছুই। এখানে ঘটছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। তিনি দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু এই সময় হ্যারো একপাশে ঘুরে গেল দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলার জন্য, যা ঘটার কথা দ্বাদশ ঘণ্টায়। সহস্র ধারায় রক্ত ঝরছে অফিসারের

দেহ থেকে; পানি মিশছে না— কারণ পানির পিচকিরিও কাজ করছে না। শেষ কাজটাও ঠিকমতো ঘটল না— লম্বা সূচগুলো থেকে দেহটা খসে পড়ল না গর্তে। রক্তমাখা দেহটা ঝুলে রইল গর্তের উপর। হ্যারো চেষ্টা করল নিজের জায়গায় ফিরতে, কিন্তু যেহেতু সেটা ভারমুক্ত হতে পারেনি, তাই সেখানেই দাঁড়িয়ে বার বার ঝাঁকি দিয়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করল দেহটাকে।

'শিগগির এসে আমাকে সাহায্য কর।' চেঁচিয়ে ডাকলেন তদন্তকারী। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন অফিসারের পায়ের গোছা। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি এদিকে ধরবেন আর অন্য দুজন মাথার দিকে ধরলে আস্তে আস্তে উঁচু করে অফিসারের দেহটাকে ছাড়িয়ে আনতে পারবেন সূচ থেকে।

কিন্তু অন্য দুজন সাহায্যের ব্যাপারে তখনো মনস্থির করতে পারেনি। আসামিটা তো চলে যাবার জন্য পা বাড়াল। তদন্তকারী দৌড়ে কাছে গিয়ে ধমকে ওদের ফিরিয়ে আনলেন। ওরা এসে ধরল অফিসারের মাথা। এইসময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তদন্তকারী দেখলেন অফিসারের মুখটা। জীবিতকালের মতোই। অঙ্গীকারকৃত মুক্তির কোনো চিহ্ন নেই। ঠোঁটদুটো পরস্পরকে চেপে ধরা, চোখ খোলা— শান্ত এবং অনুভূতিহীন। কপাল ফুঁড়ে ঢুকে গেছে একটা বিরাট লোহার সূঁচ।

আসামি আর সেপাইকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে চললেন তদন্তকারী। সেপাই একটা ঘর দেখিয়ে বলল, 'ওই যে পানশালা!'

একতলা ঘর, মেঝেতে গর্ত। দেয়াল এবং ছাদ কালো হয়ে গেছে ধোঁয়ায়। রাস্তার দিকে দেয়ালজোড়া দরজা। পুরোপুরি খোলা। কলোনির অন্য বাড়িগুলোর সাথে পানশালার তেমন কোনো পার্থক্য নেই। সবগুলোই প্রায় ধসে পড়া অবস্থায়, এমনকি কমান্ডান্টের হেডকোয়ার্টারও। দেখে মনে হয় অতীত যুগের। তিনি সঙ্গীদের নিয়ে হেঁটে গেলেন পানশালার দিকে। টেবিল পাতা। ভেতরে ঠাণ্ডা, ভারি আবহাওয়া।

'বুড়োটাকে এখানেই কবর দেওয়া হয়েছে'। সেপাই বলল, 'পুরোহিত তাকে গোরস্থানে কবর দিতে দেননি। কেউই বলতে পারছিল না তাকে কোথায় কবর দিতে হবে। শেষপর্যন্ত এখানেই কবর দেওয়া হয়েছিল। অফিসার আপনাকে এ-কথা বলেনি, কারণ ঘটনাটা নিয়ে সে খুব লজ্জিত ছিল। সে অবশ্য রাতের অন্ধকারে কয়েকবার চেষ্টা করেছে বুড়োটাকে এখান থেকে তুলে নিতে, কিন্তু প্রত্যেকবারই তাকে প্রতিহত করা হয়েছে।'

'কবরটা কোথায়?' জিগ্যেস করলেন তদন্তকারী। সেপাইয়ের কথা তার অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে।

সেপাই ও আসামি দৌড়ে গিয়ে দেখাল কবরটার অবস্থান। পেছনের দেয়াল ঘেঁষে। সেখানে টেবিলে বসে আছে কয়েকজন খদ্দের। মনে হল সবাই বন্দরের শ্রমিক।

লোকগুলো শক্তপোক্ত গড়নের, প্রত্যেকের মুখে চকচকে কালো দাড়ি। কারো গায়ে জ্যাকেট নেই, শুধু ছেঁড়া জামা। এরা সবাই দরিদ্র-তুচ্ছ প্রাণী। তদন্তকারী তাদের কাছাকাছি এলে কয়েকজন উঠে দাঁড়াল। দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তাদের দৃষ্টিতে ঘৃণা। তদন্তকারী বুঝলেন, সবাই ঘৃণা করে আগের কমান্ডান্টকে। শুধু একজনই পছন্দ করত; ভালোবাসত। আজ সে তার ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছে।

মা

নাতালিয়া গিনসবার্গ

[নাতালিয়া গিনসবার্গকে বলা হত 'নিজের সঙ্গে কথোপকথনরত লেখক'। তাঁর গদ্য নিরুত্তাপ। আটপৌরে শব্দ, ব্যবহারের প্রবণতা আর শব্দের পুনরাবৃত্তির কারণে তাঁর গদ্য সবসময়ই কবিতাক্রান্ত। ইহুদি বাবা-মায়ের কন্যা নাতালিয়ার জন্ম ইতালির পালের্মোতে ১৯১৬ সালে। তাঁর গিনসবার্গ পদবি এসেছে প্রথম স্বামী রুশ বংশোদ্ভূত রাজনৈতিক সাংবাদিক লিয়োনে গিনসবার্গের কাছ থেকে]

তাদের মা ছিল খুবই হালকা পাতলা, ছোটখাটো কাঁধ দুটো ছিল গোলাকার। নীল স্কার্ট আর লাল উলের ব্লাউজ ছিল তার সবসময়ের পোশাক। ছোট কোঁকড়ানো ঝোপের মতো চুলগুলো ক্রিম মাখা থাকায় দারুণ চকচকে দেখাত। তাদের মা প্রতিদিন ভ্রু প্লাক করত নিজে নিজে। সেখানে আঁকত দুটি কালো মাছ, যেগুলো সাঁতরে বেড়াত তার কপালের নিচে এবং সে মুখে মাখত হলুদ পাউডার। তাদের মায়ের বয়স যে কত তা তারা জানত না। তবে স্কুলে সহপাঠীদের মায়ের তুলনায় তাদের মাকে খুবই কমবয়সী দেখাত। তারা বন্ধুদের মায়েদের দেখে খুব অবাক হয়ে যেত। কী মোটা আর ভারিক্কি তারা! মায়ের আঙুলে ছিল নিকোটিনের দাগ, কারণ মা ধূমপান করত খুব বেশি, এমনকি ঘুমাবার আগ পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়েও।

তারা তিনজন একই খাটে, একই হলুদ লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমাত। শোবার সময় মায়ের পছন্দ ছিল খাটের দরজার দিকের প্রান্তটা। পাশেই বেডসাইড টেবিলে ছিল একটি লাল কাপড়ে মোড়ানো টেবিলল্যাম্প। রাতে বাতি জ্বেলে পড়ার অভ্যাস ছিল মায়ের।

কোনো কোনো রাতে মা ঘরে ফিরত অনেক দেরিতে। তারা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ত। মায়ের ঘরে ঢোকার শব্দে ঘুম ভেঙে তারা জিগ্যেস করত, এত দেরি হল কেন। মা প্রায় সবসময়ই উত্তর দিত 'সিনেমায় গিয়েছিলাম।' অথবা বলত 'আমার বান্ধবীর সঙ্গে ছিলাম'। তারা জানত না কে এই বান্ধবী, কারণ কোনোদিন তারা কোনো মহিলাকে মায়ের কাছে আসতে দেখেনি।

কাপড় বদলাবার সময় মা তাদের পাশ ফিরতে বলত। তার দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়ালজুড়ে নাচতে দেখত মায়ের ছায়া। সিল্কের নাইটড্রেস পরে মা শুতে এলে তারা চেষ্টা করত মাকে যতটা সম্ভব বিছানায় বেশি জায়গা দিতে। তবুও মা রোজই অভিযোগ করত যে, তারা নাকি ঘুমের মধ্যে মাকে ঠেলতে ঠেলতে বিছানা থেকে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করে অথবা হাত-পা ছুঁড়ে আঘাত করে।

তাদের কাছে মা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ ছিল নানা-নানী। ক্লেমেনটিনা চাচি থাকতেন গ্রামে। মাঝে মাঝে আসতেন বাদাম আর ভুট্টার ময়দা নিয়ে, তাকেও বেশ গুরুত্ব দিত তারা। কাজের মেয়ে দিওমিরা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি তাদের প্রতিবেশী জিওভান্নি, যে বেতের চেয়ার বানাত, তাকেও তারা গুরুত্বপূর্ণ মনে করত। দুই ভাইয়ের কাছে তাদের সবাইকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হত কারণ এরা ছিল বলিষ্ঠ মানুষ, যাদের ওপর ভরসা করা যায়। এরা যে কোনো কাজে সম্মতি বা অসম্মতি জানাতে পারে স্পষ্ট ভাষায়, নিজ নিজ কাজে তারা দক্ষ, শক্তি আর বুদ্ধি বেশি অর্থাৎ এরা সেই ধরনের মানুষ যারা তোমাকে ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু বাড়িতে মায়ের উপস্থিতিতেও দুই ভাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগত। মা কোনোকিছুতেই সায়ও দিত না, নিষেধও করত না। বার বার জিগ্যেস করলে শুধু বলত, 'এভাবে হৈচৈ করো না তো, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে'। অথবা বলত, 'নানীকে গিয়ে বলো।' কোনো মতামত দিতে গিয়ে একবার বলতো হ্যাঁ, তারপরই না, একটু পরেই আবার হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা গোলমাল পাকিয়ে যেত। মায়ের সঙ্গে বাইরে যাওয়াও বিব্রতকর। কারণ সে প্রায় সময়ই রাস্তা পার হতে চাইত ভুল জায়গা দিয়ে। বার বার পুলিশ এসে ধরত, শুধরে দিত। দোকানে ঢুকে জিনিস চাইত খুব ভীরু গলায় আর সবসময়ই কিছু না-কিছু ফেলে আসত দোকানে। এসবে খুব লজ্জা পেত তারা।

মায়ের ড্রয়ার সবসময় খোলা আর জিনিসপত্র ছড়ানো-ছিটানো এদিক-সেদিক। সকালে ঘর গোছাতে এসে রাগে গজগজ করত দিওমিরা। কখনো কখনো বেশি রেগে গেলে নানীকে ডেকে দেখাত ঘরের ছিরি। তারা দুজন মিলে গোছাত মায়ের কাপড়-চোপড়, পরিষ্কার করত মেঝেময় ছড়িয়ে থাকা সিগারেটের টুকরো আর ছাই।

সকালে উঠে মা প্রথমেই যেত বাজারে। ফিরে এসে চটের ব্যাগটি রান্নাঘরের টেবিলে ছুঁড়ে দিয়েই সাইকেল নিয়ে দুদ্দাড় রওনা দিত অফিসের দিকে। দিওমিরা ব্যাগ থেকে একটি একটি করে বের করত সবজি আর গজগজ করত— মানুষ এমন পচা জিনিস বাজার থেকে আনে! দুপুর দুইটায় খেতে আসত মা। তড়িঘড়ি লাঞ্চ সেরেই বেরিয়ে যেত সাইকেল নিয়ে।

তারা তাদের হোমটাস্ক করত বেডরুমে বসেই। বিছানার মাথার দিকে একটি বড় বাঁধানো ছবি। চৌকা কালো দাড়ি, টাক মাথা, কচ্ছপের খোলের চশমা পরা

একজন মানুষের। মানুষটি তাদের বাবা। আরেকটি ছোট ছবিও আছে। ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাবা। খুব ছোটবেলায় মারা যাওয়া বাবার প্রসঙ্গে কিছুই মনে নেই তাদের। বড় ছেলেটির মনে খুব ঝাপসা একটি স্মৃতি আছে। বহুদূর থেকে দেখা একটি ঝাপসা দুপুরের মতো অস্পষ্ট ছবি। ক্লেমেনটিনা চাচিদের গ্রামে একটি ঘাসে ছাওয়া মাঠে কাঠের ঠেলাগাড়িতে বসে আছে সে, আর বাবা ঠেলছে গাড়িটা। বাতাসে উড়ছে বাবার লম্বা দাড়ি। দুজনেই হাসছে খুশিতে। পরে সে অবশ্য গাড়িটির টুকরো টুকরো কিছু অংশ, একটি হাতল, আর একটি চাকা খুঁজে পেয়েছিল ক্লেমেনটিনা চাচির চিলেকোঠায়। তারা দুজনেই বাবা সম্পর্কে আর কিছু মনে করতে পারে না। তবে তারা ভাবে, বাবা ছিল নিশ্চয়ই সেইসব দৃঢ়চেতা মানুষের দলে যার ওপর নির্ভর করা চলে। নানা বা দিওমিরা যখন মায়ের ওপর রেগে ওঠে, তখন নানী বলে, তাদের মায়ের ওপর সহানুভূতি থাকা উচিত। কারণ সে সত্যিই অভাগিনী। ইউজেনিও অর্থাৎ তাদের বাবা বেঁচে থাকলে মা এমন হয়ে যেত না। বিকালে চা পানের সময় তারা খেত বাদাম অথবা ভিনেগার মেশানো রুটি। তারপর তাদের হোমটাস্ক শেষ হয়ে থাকলে তারা খেলতে যেত ছোট্ট পার্কটিতে। পার্কে ছিল অনেক পায়রা। তারা পায়রাগুলোকে ছুড়ে দিত রুটির টুকরো। মাঝে মাঝে দিওমিরা তাদের হাতে কাগজের ঠোঙায় দিয়ে দিত চাল বা গম। পায়রাদের জন্যেই। সেখানে এসে জুটত পাড়ার সব ছেলে। তারা ফুটবল অথবা চোর-পুলিশ খেলত। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নানী তাদের খেলা দেখত, মাঝে মাঝে সাবধানও করত, পড়ে গিয়ে তা তারা যেন হাত-পা না ভাঙে।

সন্ধ্যায় অন্ধকার পার্ক থেকে তাদের তিনতলার আলোঝলমলে জানালাটিকে খুব সুন্দর দেখাত। ওই ঘরে তারা ফায়ারপ্লেসের পাশে বসতে পারে। ওই ঘরই তাদের অন্ধকারের বিপদ থেকে নিরাপত্তা দিতে পারে। নানী তখন রান্নাঘরে কাপড়ে ফুল তুলছে। নানা পাইপ কামড়ে বসে আছেন আরাম কেদারায়। নানী ছিল খুবই মোটা। গলায় চেইনের সাথে ঝোলানো একটি মেডেল। তাতে তাদের অর্নেস্টা মামার ছবি। মামা মারা গিয়েছিল যুদ্ধে। নানীর হাতে পিৎজা খুবই মজাদার। নানী তাদের কোলে বসিয়ে গল্প শোনাত আর কাঠি দিয়ে পরিষ্কার করত কানের ময়লা। মাঝে মাঝে নানাও মুখে পাইপ নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তাদের গল্প শুনতেন।

তাদের নানা খুব ভালো গ্রিক আর ল্যাটিন জানতেন। চাকরিতে পেনশন পাওয়ার পর তিনি তখন লিখছিলেন একটি গ্রিক ব্যাকরণ বই। তাঁর পুরনো কিছু ছাত্র প্রায়ই আসত তাঁর কাছে। দিওমিরা তাদের আপ্যায়িত করত কফি দিয়ে। নানা সবসময় চিন্তিত থাকতেন, কেননা জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। প্রায় প্রত্যেক সকালেই নানীর সঙ্গে তাঁর মৃদু বিতণ্ডা হত খরচ নিয়ে। নানার ধারণা, দিওমিনা চিনি চুরি করে বার বার কফি বানিয়ে খায় বলেই এত বেশি চিনি কিনতে হচ্ছে প্রতিমাসে। এ কথা শুনেই দিওমিরা ঝাঁজিয়ে উঠত। হাত নাচিয়ে বলত— কফি

সে বেশি বেশি বানায় বটে তবে খায় না। কফি খায় কর্তার ছাত্ররা। এসব ঝগড়া অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি মিটে যেত। দুই ভাই এসব ঝগড়া নিয়ে মাথা ঘামাত না। কিন্তু ভয় পেত যখন ঝগড়া বাধত মা আর নানার মধ্যে। মা বেশি রাত করে বাড়ি ফিরলে ঘটত ব্যাপারটা। মায়ের ফেরার শব্দে নানা বেরিয়ে আসতেন নিজেদের শোবার ঘর থেকে খালি পায়ে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বলতেন, 'আমি কি বুঝি না? আমি বুঝি তুমি কোথায় কার সঙ্গে ছিলে এতক্ষণ। আমি জানি তুমি আসলে কী।' মা-ও চেঁচিয়ে বলত, 'আমি তোমার ধার ধারি না। চেঁচিও না। বাচ্চারা জেগে যাবে।' নানা বলতেন, 'বাচ্চাদের কথা তুমি যে কতখানি ভাবো, তা আমরা জানি। পাশ কাটাবার চেষ্টা করো না। আমি জেনে গেছি তোমার আসল রূপ। তুমি একটা কুত্তি। রাতভর তুমি ক্ষেপা কুত্তির মতো ছুটে বেড়াও।' নানী আর দিওমিরা নিরস্ত করতে চাইত নানাকে। ঠেলতে ঠেলতে ঢুকিয়ে দিত তার ঘরে। আর মা ঘরে ঢুকেই সটান শুয়ে পড়ত বিছানায়। অন্ধকার ঘরে প্রতিধ্বনি উঠত তার ফোঁপানির। বাচ্চারা ভাবত, নানার কথাই ঠিক। মায়ের উচিত নয় বান্ধবীর সঙ্গে এত রাতে সিনেমায় যাওয়া। তাদের খুব কষ্ট হত। কষ্ট আর ভয়। দুই ভাই পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বিছানায় মিশে যেতে চাইত। মা আর ছোটভাইয়ের মাঝখানে ঘুমাত বড় ভাইটি, চেষ্টা করত মায়ের শরীরে যেন কোনোভাবেই স্পর্শ না করে তার শরীর। মায়ের কান্না এবং ভেজা বালিশ ছিল তার কাছে ভীষণ বিরক্তিকর। মা আর নানার এই ঝগড়া নিয়ে তারা কখনো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত না। সযত্নে এড়িয়ে চলত এই প্রসঙ্গ। কিন্তু তারা দুই ভাই পরস্পরকে খুবই ভালোবাসত। তাদের মা কাঁদত আর তারা পরস্পরকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরত। কিছুক্ষণ পরই অবশ্য তারা ভুলে যেত যে, তারা অসুখী। পরের দিনটি শুরু হলেই তারা স্কুলে যেতে পারত, সেখানে পেত তাদের বন্ধুদের আর ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই মেতে উঠত খেলায়। খুব ভোরে ধূসর আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছাড়ত মা। কোমরের খাঁজে পেটিকোটের ফিতার গভীর দাগে, গলায় আর হাতে সাবান মাখত সে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে। চেষ্টা করত এসময় বাচ্চারা যেন তাকে দেখতে না পায়। কিন্তু আয়নায় তারা ঠিকই দেখতে পেত মায়ের বাদামি কাঁধ আর ছোট ছোট দুই স্তন। দুই হাত উঁচু করে সে বগলে পাউডার ছড়াত অকৃপণভাবে। কাপড় পরার পর শুরু হত তার ভ্রু প্লাক করা। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে আয়নাতে নাক ঠেকিয়ে দারুণ যত্নে কাজটি করত সে। তারপরের কাজ ছিল মুখে ক্রিম মেখে ঘষে ঘষে বিভিন্ন লোশন লাগানো। এক সময় হলুদ রঙের ছোপে মুখ রাঙিয়ে গেলে তবেই সে থামত।

কোনো কোনো ভোরে মা বেশ ফুরফুরে মেজাজে থাকত। গল্প করতে চাইত বাচ্চাদের সঙ্গে। জিগ্যেস করত স্কুলের কথা, সহপাঠীদের কথা। গল্পের মাঝপথেই সে তুলে নিত তার ব্যাগ, ঝুঁকে চুমু খেত বাচ্চাদের কপালে। তারপর স্কার্ফ উড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে যেত ক্রিম এবং পাউডার-মাখা হলুদ মুখ নিয়ে।

ছেলেদের মাঝে মাঝে অবাক লাগত যে, এটিই তাদের মা। তার ছোট্ট পেটে তারা একসময় ছিল। যখন তারা শিখেছিল যে, বাচ্চারা জন্মাবার আগে থাকে মায়ের পেটে তখন তারা অবাক হয়েছিল। একটু লজ্জাও পেয়েছিল তার পেটের মধ্যে থাকার কথা ভেবে। সে তাদের বুকের দুধ খাইয়েছে, এই কথাটা আরো বেশি বিস্ময়কর। কিন্তু এখন তো কোনো ছোট বাচ্চা নেই, যাকে তার দুধ খাওয়াতে বা কোলে নিতে হয়। বরং তারা তাকে প্রতিদিন লাফ দিয়ে সাইকেলে উঠতে আর বেশ সুখী মুখে এঁকেবেঁকে সাইকেল চালাতে দেখে। বাচ্চারা আসলে তাকে মা বলে ভাবতেই পারে না। অন্য ছেলেরা তাদের মাকে সব কথা বলতে পারে, অনেক কথা জিগ্যেস করতে পারে, তাদের গাউনে যখন-তখন মুখ ঘষতে পারে, দেখাতে পারে তাদের হোমটাস্কের খাতা কিংবা কমিকসগুলো। সেইসব মায়েদের মধ্যে মা মা গন্ধ। তারা সব নানী কিংবা দিওমিরার মতো মানুষ, যাদের ওপর নির্ভর করা যায়। তারা সেই ধরনের মানুষ যারা ভুল করে না, জিনিস হারায় না, দেরাজে তালা লাগাতে ভুলে যায় না, রাত করে বাড়ি ফেরে না। অন্যদিকে তাদের মা দোকানে জিনিস কিনে খালি হাতে চলে আসে। জিনিস কিনতে গিয়ে বার বার ঠকে। বাচ্চারা বুঝতে পারে না কিভাবে তাদের মা অফিসে কাজ করতে পারে। সে কিভাবে ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় চিঠিগুলো টাইপ করতে পারে! কে জানে, হয়তো অফিসে সে খুবই দক্ষ কর্মচারী।

একদিন তারা বেড়াতে গিয়েছিল ইয়ুথ ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে ছিল ডন ভিগলিয়ানি। বিকালে ফেরার পথে শহরতলির এক রেস্টুরেন্টে হঠাৎ তারা মাকে দেখতে পেল। জানালা দিয়ে দেখা গেল মায়ের সঙ্গে একজন লোক। মায়ের সেই চিরপরিচিত স্কার্ফটি টেবিলের উপর রাখা। পাশে তার কুমিরের চামড়ার হাতব্যাগ। লোকটার গোঁফ বাদামি। পরনে একটি ঢিলা ওভারকোট। হাসিমুখে কথা বলছে মায়ের সঙ্গে। মায়ের মুখে সুখী সুখী ভাব। সুখী এবং কোমল, বাড়িতে যেমনটি কখনো দেখা যায় না। মায়ের হাত লোকটির হাতে। মা তাদের দেখতে পায়নি। ওদের ইচ্ছা ছিল একটু ভালো করে দেখার। কিন্তু ট্রাম ধরতে হবে বলে ডন ভিগলিয়ানি তাড়া দিচ্ছিল। ট্রামে ওঠার পর ছোট ছেলেটি ভাইয়ের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি মাকে দেখেছ?' বড় ভাই বলল, 'না, দেখিনি।' ছোট ভাইটি হাসল, 'আমি জানি তুমি মাকে দেখেছ। সঙ্গের লোকটিকেও।' বড় ভাই মুখ ফিরিয়ে নিল। তার খারাপ লাগছে ছোট ভাইটির জন্য। নিজের জন্যও। যদিও কেন খারাপ লাগছে তা সে বুঝতে পারছে না। যা দেখেছে তা নিয়ে ভাবতে পর্যন্ত ইচ্ছা হচ্ছে না তার।

তারা বাড়িতে কারো কাছেই এ-কথা বলেনি। পরদিন সকালে মা যখন সাজগোজ করছিল, ছোট ছেলেটি হঠাৎ বলে ফেলল, 'গতকাল আমরা ডন ভিগলিয়ানির সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে তোমাকে দেখেছি। একটি লোকের সঙ্গে।' 'হতেই পারে না! অবশ্যই না। কী আবোল-তাবোল বকছ! গতকাল আমি তো অনেক রাত অব্দি

অফিসে কাজ করেছি। তুমি বোধহয় ভুল দেখেছ।' ছোট ছেলেটি কিছু বলার আগেই বড় ভাই ক্লান্ত গলায় বলল, 'না না, ওটা তুমি ছিলে না। তোমার মতোই দেখতে অন্য কেউ।' দুই ভাই-ই বুঝতে পারল সেই স্মৃতিটি মুছে ফেলতে হবে। তারা জোরে জোরে নিশ্বাস ছাড়তে লাগল, যেন স্মৃতিটিকে বুকের ভেতর থেকে বের করে দিচ্ছে।

কিন্তু ঢিলা ওভারকোট পরা লোকটি একদিন তাদের বাড়িতে এসে হাজির। সেদিন অবশ্য তার পরনে ওভারকোট ছিল না, কারণ দিনটি গরম। তার চোখে ছিল নীল চশমা, পরনে লিনেনের স্যুট। নানা-নানী গিয়েছিল মিলানে। আর দিওমিরা গিয়েছিল তার গ্রামের বাড়িতে। অর্থাৎ বাড়িতে শুধু দুই ভাই আর মা ছিল।

দুপুরের খাবারটি সেদিন দারুণ হল। দোকান থেকে ভালো ভালো খাবার এনেছিল মা। ছিল মুরগির মাংসের সঙ্গে চিপস। মা পাস্তা রেঁধেছিল দারুণ। তবে সসটি একটু পুড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে ওয়াইন ছিল। তাদের মাকে নার্ভাস লাগছিল। আবার উচ্ছ্বসিতও। তড়বড় করে কথা বলছিল। বাচ্চাদের সম্পর্কে বলছিল লোকটিকে, লোকটি সম্বন্ধে বলছিল বাচ্চাদের। লোকটির নাম ম্যাক্স। সে নাকি অনেকদিন আফ্রিকাতে ছিল। তার কাছে আফ্রিকায় তোলা অনেক ফটোগ্রাফ ছিল। ওরা সেগুলো দেখল। একটি বানরের ছবিও ছিল। ওটি নাকি ম্যাক্সের পোষা। ভীষণ বুদ্ধিমান আর আমুদে। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে, বানরটিকে আফ্রিকায় রেখে আসতে হয়েছে। বানরটি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং ম্যাক্সের ভয় হচ্ছিল হয়তো সে স্টিমারেই মারা পড়বে। ছেলেরা ম্যাক্সকে পছন্দ করে ফেলল। ম্যাক্স ঘোষণা করল, বাচ্চাদের একদিন সিনেমায় নিয়ে যাবে। সে আগ্রহ নিয়ে বাচ্চাদের বই দেখল। জানতে চাইল, ওরা 'সাটারনিনো ফারানডোলা' বইটি পড়েছে কিনা এবং 'রবিনসন ক্রুসো।' তারা এগুলো পড়েনি শুনে সে ওদের বইগুলো এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল।

খাওয়া শেষে তাদের পার্কে খেলতে যেতে বলায় তারা দুই ভাই-ই একটু আপত্তি করল। ম্যাক্সের কাছে থাকতেই তাদের ভালো লাগছে। কিন্তু মা এবং ম্যাক্স দুজনই বলল, তাদের খেলতে যাওয়া উচিত।

সন্ধ্যায় খেলাশেষে তারা বাড়ি ফিরে দেখল ম্যাক্স চলে গেছে। মা দ্রুত হাতে রাতের খাবার তৈরি করল— আলু, সালাদ আর দুধ। তারা বেশ আনন্দে ছিল। গল্প করছিল ছবিতে দেখা বানরকে নিয়ে। মা-ও অংশ নিচ্ছিল তাদের সঙ্গে। শুতে যাওয়ার সময় মা তাদের কপালে চুমু খেয়ে বলল, ম্যাক্সের কথা নানা-নানীকে না বলাই ভালো। তারা হয়তো ম্যাক্সকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাবার ব্যাপারটি পছন্দ করবে না।

পরের কয়েকদিন তারা মায়ের সঙ্গে কাটাল। হ্যাম, কফি, জ্যাম আর শুকনো খাবার খেতে হত তাদের। কারণ মা রান্নাবান্না আদৌ পছন্দ করত না। নানা-নানী ফিরে

এলে ছেলেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ডাইনিং টেবিলে পরিচ্ছন্নতা আর প্রাচুর্যতা ফিরে এল। গ্লাস-থালা-বাসন যেখানে যা থাকার কথা সেখানে সাজানো হল। নানার রকিং চেয়ার আবার পাতা হল। সিগারেটের পরিচিত গন্ধে আবার ভুরভুর করে উঠল জায়গাটা।

ছেলেরা নানা-নানীকে ম্যাক্স সম্পর্কে কিছু বলেনি। তবে তারা প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করেছিল কবে বইগুলো পাবে আর ম্যাক্স তাদের নিয়ে সিনেমায় যাবে। তারা ম্যাক্সের কাছে বানরটির আরো ছবি দেখতে চাইবে। দুই-একবার তারা মাকে জিগ্যেস করেছে। কিন্তু মা কর্কশভাবে উত্তর দিয়েছে যে, ম্যাক্স এখান থেকে চলে গেছে। ছোট ছেলেটি জিগ্যেস করেছিল, ম্যাক্স আবার আফ্রিকায় ফিরে গেছে কিনা। মা কোনো উত্তর দেয়নি। কিন্তু ছেলেটির ভাবতে ভালো লাগছিল যে, ম্যাক্স আফ্রিকায় ফিরে গেছে। সে কল্পনা করে, হঠাৎ একদিন ম্যাক্স উপস্থিত হবে তাদের স্কুলে। সঙ্গে একজন আফ্রিকান ভৃত্য, কাঁধের উপর ছোট্ট বানরটি।

ছুটিশেষে তাদের স্কুল খুলল। তাদের বাড়িতে ক্লেমেনটিনা চাচি এল ঝুড়িভর্তি নাশপাতি আর আপেল নিয়ে। মায়ের মেজাজ দিন দিন আরো খিটখিটে হয়ে যাচ্ছিল। নানার সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছিল প্রায়ই। মা রাতে বাড়ি ফিরত দেরিতে। রাতে ঘুমাত না। সিগারেট টানত একটির পর একটি। খাওয়া কমে গিয়েছিল আর শুকিয়ে যাচ্ছিল আরো। শীর্ণ হলুদ হয়ে গিয়েছিল মুখটি। খুবই কম কথা বলত মা। মনে হত কথা বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। একদিন মা বাড়িতে ফিরল বিকাল পাঁচটায়। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার। কারণ, এত সকাল সকাল তো সে ফেরে না! বাড়ি ফিরেই মা বেডরুমের দরজা আটকে দিল। ছোট ছেলেটির একটি বই দরকার ছিল। দরজায় নক করায় মা ভিতর থেকে রাগী স্বরে জানাল যে, সে ঘুমাতে চায়, তাকে একটু শান্তিতে ঘুমাতে দেওয়া হোক। ছেলেটি খুব করুণভাবে বলল যে, বইটি তার খুবই দরকার। তখন মা দরজা খুলল। মায়ের মুখ ভেজা আর ফোলাফোলা। ছেলেটি নানীর কাছে জানাল 'মা কাঁদছে।' নানী আর ক্লেমেনটিনা চাচি এই ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা শুরু করল। কিন্তু ছোট ছেলেটি তাদের আলাপের সামান্যতম অর্থও উদ্ধার করতে পারল না।

এক রাতে মা বাড়িতে ফিরল না। ছেলেদের ভালো ঘুম হয়নি সে-রাতে। নানা-নানী সারা রাত পায়চারি করেছে। জানালা খুলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। সকালে পুলিশ এসে জানাল তাদের মাকে একটি হোটেলে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে মা। চিঠিতে লিখে গেছে সে কথা। দুই ভাইকে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সবাই। তাদের রেখে গেল নিচতলার বৃদ্ধের কাছে। বৃদ্ধা বার বার বলছিল— 'হৃদয়হীনা মা, এমন দুটি বাচ্চাকে এভাবে রেখে যেতে পারল!' তাদের মাকে বাড়িতে আনা হল। ছেলেরা দেখল, মাকে বিছানায়

শুইয়ে রাখা হয়েছে। দিওমিরা মাকে লাল সিল্কের পোশাক পরাল যা নাকি তার বিয়ের পোশাক ছিল। মাকে দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন একটি ছোট মরা পুতুল।

সেই পুরনো ঘরের মধ্যে ফুল আর মোমবাতি বেখাপ্পা লাগছিল। দিওমিরা, নানী আর ক্লেমেনটিনা চাচি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছিল আর বলছিল, মা ভুল করে বিষ খেয়েছে। নইলে প্রভু যিশু যদি জানেন যে, মা স্বেচ্ছায় বিষ খেয়েছে তাহলে তিনি মাকে আশীর্বাদ করবেন না। দিওমিরা ছেলেদের বলল তাদের মাকে চুমু খেতে। তারা ভীষণ লজ্জা পেলেও একে একে মায়ের ঠাণ্ডা গালে চুমু খেল।

শবযাত্রায় তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ডন ভিগলিয়ানিসহ ইয়ুথ ক্লাবের ছেলেরা। তাদের স্কুলের বন্ধুরাও। হাঁটতে তাদের ভীষণ ক্লান্তি লাগছিল। গোরস্তান ছিল অস্বস্তিকর রকম ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে। বাড়ি ফিরেই নানী কাঁদতে শুরু করল। ডন ভিগলিয়ানি বলল, তাদের মা এখন স্বর্গে। সম্ভবত সে জানত না যে, মা স্বেচ্ছায় বিষপান করেছে; অথবা জেনেও সে না-জানার ভান করছে। ছেলেরা সত্যিই নিশ্চিত ছিল না স্বর্গ আছে কিনা এ ব্যাপারে। কেননা নানা বলত— স্বর্গ নেই; নানী বলত— আছে। তাদের মা-ও একবার বলেছিল স্বর্গ নেই, কাজেই সেখানে ছোট্ট পরী কিংবা মধুর সংগীত থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তবে মৃতরা এমন এক জায়গায় যায় যেখানে সুখ-অসুখ কিছুই নেই, আছে শুধু শান্তি।

কিছুদিনের জন্য ছেলেরা ক্লেমেনটিনা চাচির সঙ্গে গ্রামে গেল। প্রত্যেকেই তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করত। আদর করে চুমু খেত। আর তারা লজ্জা পেত ভীষণ। তারা কখনো মা কিংবা সিনর ম্যাক্স সম্বন্ধে কিছু বলত না। চিলেকোঠার র‍্যাকে তারা পেয়ে গেল 'সাটারনিনো ফারানডোলা।' বইটি বার বার পড়ল। দারুণ মজার বইটি। বড় ছেলেটি মাঝে মাঝে মায়ের কথা ভাবত। তার মনে হয়েছিল সিনর ম্যাক্স আফ্রিকায় চলে গেছে বলেই মা বিষ খেয়েছে। ক্লেমেনটিনা চাচির ছোট্ট কুকুর 'বুবি'র সঙ্গে তারা ছোটাছুটি করত, গাছে চড়ত। নদীতে সাঁতার কাটতে যেত। সন্ধ্যায় ক্লেমেনটিনা চাচির সাথে কাটাকুটি খেলত। খুব সুখী মন নিয়ে তারা নানীর কাছে ফিরে এল। নানী আগের মতোই তাদের কানের ময়লা পরিষ্কার করে। রোববারে তারা গিয়েছিল গোরস্তানে। ফুল নিয়ে। বিছানাটি তাদের কাছে খুব বড় মনে হচ্ছিল। তারা মাকে নিয়ে ভাবতে চাইত না, কেননা মায়ের কথা মনে হলে একটু কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে তারা মায়ের চেহারা কল্পনা করতে চেষ্টা করত। তার ঢেউখেলানো চুল, ভ্রুতে আঁকা জোড়া মাছ, তার ঠোঁট। দিনে দিনে আবছা হয়ে আসছিল সেই ছবি। মা যে খুব পাউডার মাখত সে কথা অবশ্য অনেকদিন মনে ছিল তাদের। এখন তারা বুঝতে শিখেছে যে, তারা তাদের মাকে খুব একটা ভালোবাসত না। সম্ভবত তাদের মা-ও তাদের খুব একটা ভালোবাসত না। দিওমিরা আর নিচতলার বৃদ্ধা যেমন বলেছিল, বাচ্চাদের ভালোবাসলে মা নিশ্চয়ই

বিষপান করত না। তারপর যতদিন যাচ্ছিল, ছেলেরা বড় হচ্ছিল আর প্রতিদিন এত নতুন কিছু ঘটছিল যে, পাউডার-মাখা মুখের স্মৃতিটা ছেলেদের মন থেকে একসময় অজান্তেই হারিয়ে গেল।

বেদুঈন ও ভাইপার

অ্যামোস ওজ

[পিতৃদত্ত নাম অ্যামোস ক্লজনার। পরবর্তীতে ওজ হন, হিব্রু ভাষায় যার অর্থ শক্তিমান। জন্ম জেরুজালেমে ১৯৩৯ সালের ৪ মে। ১৯৬৭ সালে অ্যামোস ওজ ইসরাইলি হিসেবে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে অংশ নেন। তবে ওই বছর থেকেই তিনি ইসরাইল ও ফিলিস্তিনিদের জন্য আলাদা আলাদা রাষ্ট্রের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসছেন। অর্থাৎ তিনি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে। হিব্রু ভাষায় ১৮টি গ্রন্থের জনক অ্যামোস ওজ। সেইসঙ্গে লিখেছেন প্রায় পাঁচশো প্রবন্ধ। তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে আরবিসহ ৪০টি ভাষায়]

দুর্ভিক্ষ তাদের ওপর আক্রমণ চালাল।

তারা ধূলি-ধূসরিত পশুপাল নিয়ে দুর্ভিক্ষের ভয়েই উত্তর থেকে পালিয়েছিল। সেপ্টেম্বর থেকে পরের বছর এপ্রিল পর্যন্ত মরুভূমি এক মুহূর্তের জন্যও সূর্যের অগ্নিবর্ষণ থেকে রেহাই পায়নি। হলুদ মাটি পরিণত হয়েছে ধুলোর পাউডারে। দুর্ভিক্ষ হানা দিয়েছে যাযাবরদের অস্থায়ী বসতিতে। তাদের পশুপালের এতই ক্ষতি হয়েছে যে তা পূরণের আশা করাই অবাস্তব।

সামরিক কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কিছুটা দ্বিধা সত্ত্বেও তারা বেদুঈনদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে উত্তরের রাস্তাটি । একটি পুরো জনগোষ্ঠীর সব নারী-শিশু-পুরুষকে তো আর অনাহারের হুমকির মুখে ফেলে রাখা যায় না!

ধুলোমাখা পথ দিয়ে এলো রোদে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া, দড়ির মতো পাকানো শরীরের, ন্যুব্জ মরুগোত্রের লোকেরা। ধুঁকতে ধুঁকতে সঙ্গে এল তাদের অস্থিচর্মসার পশুপাল। ওরা এল আঁকাবাঁকা গিরিপথ ধরে, নগররক্ষকদের নজর এড়িয়ে। ইতস্তত ছড়ানো সেটলমেন্টগুলোকে ঘিরে মানুষের একটা উত্তরমুখো স্রোত অবিরল বয়ে যাচ্ছিল। ধূসর পশুপাল দাঁড়িয়ে পড়ল সোনালি আস্তাবলের মাঠগুলোতে, তাদের দাঁত তখনো যথেষ্ট শক্ত এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। যাযাবররা চেষ্টা করছিল নিজেদের অস্তিত্ব গোপন রাখতে। প্রতিরোধ এড়ানোর জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট ছিল তারা।

আপনি যদি বিকট শব্দে ট্রাক্টর চালিয়ে ওদের পাশ দিয়ে যেতে চাইতেন, আপনার ট্রাক্টরের ধুলোয় সম্পূর্ণ ঢাকা পরে গেলেও ওরা ভদ্রভাবে তাদের পশুগুলোকে একদিকে জড়ো করে আপনাকে এগিয়ে যাবার পথ প্রশস্ত করে দিত; প্রয়োজনের চাইতেও বেশি প্রশস্ত। একপাশে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ওরা আপনার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকত। অসম্ভব উত্তপ্ত আবহাওয়া ওদের চেহারাকে ঝাপসা বানিয়ে দিয়েছে। সবার মধ্যেই একটা অবয়বগত সাদৃশ্য চোখে পড়ত— পশুপালসহ তার রাখাল, শিশুদেরসহ তাদের মা, কোটরের গভীরে ঢুকে যাওয়া চোখসহ গোত্রের বৃদ্ধ— সবাইকে দেখতে একই রকম মনে হত। ওদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল আধা-অন্ধ, অথবা ভিক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভান করত অন্ধের। তাদের মধ্যে আপনার মতো ভদ্রস্থ কাউকে পাওয়া ছিল অসম্ভব।

সযত্নে প্রতিপালিত আমাদের ভেড়াগুলোর তুলনায় তাদের পশুগুলো ছিল নিতান্তই হতশ্রী। ছোট ছোট গাঁটবহুল পা, ক্ষীণদেহ। পশুগুলোর চেহারা তাদের রাখালের মতোই করুণ।

উটগুলোই শুধু নম্র হতে অস্বীকার করছিল। লম্বা ঘাড়ের উপর দুঃখ ও ঘৃণাপূর্ণ দুই ক্লান্ত চোখ নিয়ে ওরা তাকিয়ে থাকত। মনে হত তাদের চোখে বাসা বেঁধেছে প্রবীণের আহরিত জ্ঞান, এবং তাদের চামড়ার নিচ দিয়ে মাঝে মাঝেই একটা অচেনা কাঁপুনির স্রোত বয়ে যায়।

কখনো কখনো আপনি ওদের অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে যান। পায়ে হেঁটে মাঠ পেরুনোর সময় আপনার মুখোমুখি পড়ে যায় হয়তো একটি পশুপাল। দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল। দেখলে মনে হয় তাদের পা যেন গেঁথে গেছে গনগনে মাটিতে। পশুপালের মধ্যেই শুয়ে আছে রাখাল, নিদ্রামগ্ন, যেন লম্বালম্বি একটা ব্যাসল্টের চাঁই। আপনি এগিয়ে যান। তার মুখে আপনার ছায়া পড়ে। তার চোখ সম্পূর্ণ খোলা দেখে আপনি চমকে ওঠেন। তার মুখে সবগুলো দাঁত বের করা আশ্বস্ত-সূচক হাসি। দাঁতের কয়েকটি ঝকঝকে, বাকিগুলো ক্ষয়ে গেছে। তার মুখের গন্ধ আপনার নাকে আঘাত করে। আপনি মুখ বিকৃত করেন। আর আপনার এই মুখবিকৃতি তাকে আঘাত করে, যেন সে ঘুষি খেয়েছে মুখে। খুব সাবলীলভাবে সে উঠে দাঁড়ায়, দাঁড়ায় সটান, কাঁধ উঁচু করে। আপনি নীল চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টি দিয়ে তাকে বিদ্ধ করেন। তার হাসিটা আরো চওড়া হয় এবং সে কয়েকটা ধ্বনি উচ্চারণ করে। তার পোশাকে দেশি-বিদেশি সমন্বয় ফুটে উঠেছে। ইউরোপিয়ান জ্যাকেটের উপরে সাদা মরু-আলখাল্লা। সে একদিকে মাথা কাত করে। তার মুখে একটা শান্ত দীপ্তি ফুটে ওঠে। আপনি যদি তাকে ভৎর্সনা না-করেন, হঠাৎ সে তার বাম হাত প্রসারিত করে চটজলদি হিব্রুভাষায় আপনার কাছে একটা সিগারেট চায়। তার কণ্ঠ লাজুক তরুণীর মতো মসৃণ। আপনি যদি দয়ালু নরম মুডে থাকেন, তাহলে নিজের

ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে আরেকটা ছুঁড়ে দেন তার কড়াপড়া হতের তালুতে। আপনাকে অবাক করে দিয়ে সে আলখাল্লার পকেট থেকে ঝটিতে একটা কারুকাজ করা লাইটার বের করে এবং আপনার মুখের সামনে অদৃশ্য শিখাটি তুলে ধরে। হাসিটা তার ঠোঁট থেকে কখনোই মিলিয়ে যায় না। হাসিটা অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘস্থায়ী। তার আঙুলের সোনার আংটির উপর রোদ পড়ে হঠাৎ ঝিকিয়ে ওঠে, ধাঁধিয়ে দেয় আপনার চোখকে খুব অল্পক্ষণের জন্য হলেও।

আপনি যাযাবরটির দিকে পেছন ফিরে নিজের গন্তব্যের দিকে চলতে শুরু করেন। এক শ', বা দুই শ' ধাপ পরে আপনি ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন সে একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে আছে আপনার দিকে। আপনার পিঠকে যেন বিদ্ধ করছে সেই দৃষ্টি। আপনি নিশ্চিত বলতে পারেন যে, হাসিটা তার ঠোঁটে তখনো আটকে আছে। থাকবে আরো অনেক সময় ধরে।

তারপরে আসে রাত্রে তাদের গানের কথা। সূর্যাস্তের পর থেকেই দীর্ঘ-প্রলম্বিত বিলাপের মতো সুর আচ্ছন্ন করে রাখে রাতের বাতাস। অনেক রাত পর্যন্ত। সেই কণ্ঠ কিবুজের বাগান ও রাস্তা পেরিয়ে এসে আমাদের রাতগুলোকে অস্বস্তিকর আর ভারি করে তোলে। আমরা সুনিদ্রার জন্য বিছানায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় দফের আওয়াজ। বাজতে থাকে একগুঁয়ে হৃৎপিণ্ডের মতো তালে তালে। রাতগুলো গরম। নম্র উটের বহরের মতো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আদর করে চলে চাঁদকে।

যাযাবরদের তাঁবুগুলো মোটা কাপড়ের। বিনম্র মহিলারা তাঁবুর কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায় রাতে। খালিপায়ে, নিঃশব্দে। যাযাবরদের কুকুরগুলো সারারাত ধরে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করে চাঁদের সাথে। আমাদের কিবুজের কুকুরগুলোকে ওই চিৎকার উন্মাদ করে তোলে। আমাদের সবচেয়ে সুন্দর কুকুরটি উন্মাদ হয়ে একরাতে মুরগির খোঁয়াড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তছনছ করে মেরে ফেলে মুরগির বাচ্চাগুলোকে। পাহারাদাররা কুকুরটিকে গুলি করে মেরেছিল। এটাকে নৃশংসতা বলা যায় না। তার হাতে অন্য কোনো বিকল্প ছিল না গুলি করা ছাড়া। যে কোনো যুক্তিবাদী মানুষ নিজের কাজকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণ করতে পারে।

০২.

আপনি ভাবতে পারেন যে যাযাবরদের অভিগমন আমাদের তাপক্লিষ্ট রাত্রিগুলোতে আলাদা একটা কাব্যিক ব্যঞ্জনা যোগ করেছিল। হতে পারে এ-কথাটা আমাদের কিছু অবিবাহিতা যুবতীর ক্ষেত্রে সত্য। কিন্তু আমরা আর একটা নিরেট গদ্যময় তথ্য না জানিয়ে পারছি না যে আমাদের ওপর এমন কিছু উপদ্রব শুরু হল যেগুলো মোটেই শিল্পসম্মত নয়। যেমন পশুর ক্ষুরা রোগ, ফসল ধ্বংস এবং ছিঁচকে চুরির প্রাদুর্ভাব।

ক্ষুরা রোগ বয়ে এনেছে যাযাবরদের পশুপাল। এই রোগটিকে কোনোদিনই তারা কোনো পশুডাক্তারের গোচরে আনেনি। আমরা এই রোগ প্রতিরোধের কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই এই ভাইরাস আমাদের বেশ কিছু গরুকে আক্রমণ করল, তাদের দুধের পরিমাণ গেল কমে এবং অনেকগুলো গরুর মৃত্যু ঘটল।

ফসল ধ্বংসের ব্যাপারে, আমরা অবশ্য স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমরা কেউই কোনো যাযাবরকে এই কাজটি করতে দেখিনি। অন্তত স্বচক্ষে দেখিনি। আমরা মানুষ ও পশুর পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছি সবজিবাগানের মাটিতে, গমক্ষেতে এবং ফসল-মাড়াইয়ের উঠোনে। আর দেখতে পেয়েছি সেচযন্ত্রের পাইপ, জমির সীমানাপিলার এবং অন্যান্য কৃষিযন্ত্র ইতস্তত পড়ে থাকতে ভাঙা অবস্থায়।

এইসব অত্যাচার নিঃশব্দে হজম করব এমন মানুষ আমরা নই। আমরা নিরামিষভোজী নই যে এতখানি ধৈর্যশীল হব। আমাদের যুবকদের ক্ষেত্রে কথাটি বিশেষভাবে সত্য। প্রবীণদের কেউ কেউ টলস্টয়ের আদর্শ লালন করতেন। সৌন্দর্যহানির ভয়ে আমি সেই ব্যাপারগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারছি না ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে যেগুলো ঘটিয়েছে আমাদের কয়েকজন যুবক। যেমন তারা ছিনিয়ে এনেছিল যাযাবরদের গরুর পাল, পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল একজন বেদুঈন বালককে, একজন রাখালকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। শেষোক্ত কাজের পেছনের যুক্তি ছিল এটাই, আমি পরিষ্কারভাবে বলছি, রাখালটির মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে অসম্ভব ধূর্ত। লোকটার এক চোখ ছিল অন্ধ, নাকটা ভাঙা আর তার দাঁতগুলো ছিল লম্বা ও বাঁকা; একেবারে শেয়ালের দাঁতের মতো। এই রকম বদখত চেহারার একজন মানুষের পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। তাছাড়া, এর মাধ্যমে যে শিক্ষাটি দেওয়া হল বেদুঈনরা সেই শিক্ষার কথা নিশ্চয়ই ভুলবে না।

আর চুরি ছিল সবচেয়ে ভীতিজনক ব্যাপার। তারা হাত বাড়াত আমাদের বাগানের আধাপাকা ফলের দিকে, নিয়ে যেত পানির পাইপ, মাঠে স্তূপীকৃত ফসল ভরার খালি বস্তা, চুরি করত মুরগি, এমনকি ঘর থেকেও চুরি যেত মূল্যবান সামগ্রী।

তাদের গাঢ় গাত্রবর্ণ এ ব্যাপারে তাদের সহায়ক ছিল। তারা বাতাসের মতো নিঃশব্দে ঢুকত সেটলমেন্টে। পাহারাদারের চোখ এড়িয়ে। আমরা নতুন পাহারাদার যোগ করেও তেমন ফল পেলাম না। গভীর রাতে আপনি হয়তো ট্রাক্টর বা জিপ নিয়ে দূরের ক্ষেতে যাচ্ছেন সেচের মোটরটা বন্ধ করতে, হেডলাইটের আলোয় আপনি হঠাৎ দেখতে পাবেন মানুষ কিংবা নিশাচর প্রাণীর দ্রুত অপসৃয়মাণ ছায়া। একজন পাহারাদার উত্যক্ত হয়ে একরাতে গুলিবর্ষণ করেছিল। ফলাফল হিসেবে পাওয়া গেল একটা মৃত শেয়াল।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে কিবুজের কর্তৃপক্ষ চুপচাপ বসে রইল না। এটকিন, আমাদের

সচিব, কয়েকবার পুলিশ ডেকেছে। কিন্তু পুলিশও তাদের ট্রেনিং-পাওয়া কুকুরগুলোকে সঙ্গে নিয়েও চোর ধরতে ব্যর্থ হল। পুলিশের কুকুরগুলো সীমানা পেরিয়ে মাত্র কয়েক পা এগোয়, তারপর কালো নাক উঁচু করে বাতাস শোঁকে, আকাশের দিকে মুখ তুলে কলজে হিম করা ডাক ছাড়ে, তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে আহাম্মকের মতো।

তাঁবুগুলোতে কয়েকবার আকস্মিক হানা দিয়ে তল্লাশি চালিয়েও কোনো লাভ হয়নি। ভাগ্য যেন ঠিক করেই রেখেছে যে অপরাধীকে ধরা সম্ভব হবে না। একদিন গোত্রের প্রবীণ লোকটাকে নিয়ে আসা হল কিবুজ অফিসে, সাথে জনাকয়েক অশনাক্তকৃত যাযাবর। পুলিশের গুঁতো খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা অবিরাম চিৎকার করছে—' ইয়াল্লা! ইয়াল্লা!'

আমরা, কিবুজ সেক্রেটারিয়েটের সদস্যরা, দুই সঙ্গীসহ প্রবীণ ব্যক্তিকে স্বাগত জানালাম নম্রভাবে, সম্মানের সাথে। বেঞ্চিতে বসতে দিলাম, হাসিমুখে তাদের হাতে তুলে দিলাম ধূমায়িত কফির কাপ। এটকিনের বিশেষ অনুরোধে গেউলা কফিগুলো বানিয়েছে। প্রবীণ আরব ব্যক্তিটিও সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখালেন। তার মুখে হাসি ঝুলে রইল তাকে জেরা শুরু করা থেকে শেষ করা পর্যন্ত। তিনি কথা বলার চেষ্টা করলেন সাবধানে, কেতাবি হিব্রুতে।

এ-কথা সত্য, তার গোত্রের কিছু যুবক আমাদের সামগ্রী চুরির জন্য হাত বাড়িয়েছে। তিনি কেনই-বা তা অস্বীকার করবেন! তরুণরা আসলে তরুণই; আর দিনকাল ক্রমেই খারাপ থেকে খারাপতর হয়ে যাচ্ছে। তিনি আমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন আমাদের চুরি-যাওয়া জিনিসপত্র। প্রবাদ আছে চুরির মাল দাঁত ফুটিয়ে রাখে চোরের শরীরের মাংসে। এটাই নিয়ম। মাথাগরম ছোকরাদের নিয়ে আর পারা যায় না! আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে সে জন্য তিনি বারবার তার অনুতাপ ও দুঃখ প্রকাশ করলেন। এবার তিনি তার আলখাল্লার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করলেন কয়েকটা নাটবল্টু— সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি মরচে পড়া আর কয়েকটি উজ্জ্বল, একজোড়া হুক, একটা বাঁটহীন চাকুর ফলা, একটা ভাঙা হাতুড়ি এবং তিনটি ময়লা ব্যাংক নোট আমাদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে।

হতাশায় এটকিন দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ল। অতিথির হিব্রুতে কথা বলার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে কথা শুরু করল ভাঙা ভাঙা আরবিতে। এটুকু আরবি সে শিখেছিল তার শিক্ষাজীবনের শেষের দিকে, যখন যুদ্ধ চলছিল। সে খোলাখুলিভাবে বলে চলল বিভিন্ন জাতির ভ্রাতৃসুলভ আচরণের কথা যা আমাদের আদর্শের মূলকথা। বলে চলল প্রাচ্যবাসীর সৎপ্রতিবেশীসুলভ আচরণের দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা, যা নিয়ে আমরা গর্বিত। বলে চলল রক্তপাত এবং অনর্থক ঘৃণার অসারতার কথা।

এটকিনের কৃতিত্বই বলতে হবে। সে একবারও না-থেমে বলে গেল আমাদের অতিথিরা কত দফায় চুরি করেছে, নাশকতা করেছে, আমাদের কী কী ক্ষতি করেছে। সে এটাও বলল যে, যদি এই চুরি এবং দস্যুপনা চিরতরে বন্ধ করা হয়, যদি চুরিকৃত সমস্ত মালামাল আমাদের ফেরত দেওয়া হয়, তাহলে আমরা দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির একটি নতুন অধ্যায় শুরু করতে রাজি আছি। তাহলে আমাদের শিশুরা আনন্দের সঙ্গে সৌজন্যমূলক শিক্ষাভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেদুঈনদের তাঁবুতে বেড়াতে যাবে। এবং একথা বলাই বাহুল্য যে বেদুঈন শিশুদেরও কিবুজের বাড়িগুলোতে পাল্টা ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হবে আমাদের পারস্পরিক সমঝোতা আরো গভীর করার উদ্দেশ্যে।

বৃদ্ধের হাসি একটুও চওড়া হল না। তবে পূর্বের হাসিটুকু অক্ষত রেখে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানালেন যে, তিনি যেসব দ্রব্য-সামগ্রী ফেরত দিয়েছেন, এর বাইরে আর কোনো চুরির কথা কিবুজের ভদ্রলেকেরা প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ তাদের লোকেরা আর কোনো জিনিস চুরি করেনি। আর এই চুরির জন্য তিনি ইতোমধ্যেই আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন।

যেহেতু পুলিশ অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের তদন্ত বন্ধ হয়ে গেছে; আমাদের কয়েকজন তরুণ চেয়েছিল কোনো এক রাত্রে হামলা চালিয়ে এই বর্বরদের উচিত শিক্ষা দিতে। তারা নিশ্চিত যে বর্বর বেদুঈনরা তাদের শক্তির ভাষা পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

এটকিন বিরক্ত হলেও যুক্তিসহকারে এই প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে। এর ফলে যুবকরা এটকিনকে এমন কিছু বিশেষণে বিভূষিত করেছে, যেগুলো সভ্যতার খাতিরে আমি বাধ্য হলাম উল্লেখ না করতে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এটকিন এই অপমানসূচক শব্দগুলো গায়েই মাখল না। তবে সে কিবুজের সেক্রেটারিয়েটের সামনে তাদের প্রস্তাবটি অনিচ্ছার সঙ্গে হলেও উত্থাপন করতে রাজি হল। সম্ভবত সে ভয় পাচ্ছিল যে প্রস্তাবকারীরা ব্যাপারটি নিজেদের হাতে তুলে নেবে।

সারা বিকাল এটকিন ঘরে ঘরে গেল রাত সাড়ে আটটার জরুরি মিটিং-এর বার্তা নিয়ে। সে গেউলার কাছে গিয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করল যুবকদের প্রস্তাবের কথা, তার ওপরে অগণতান্ত্রিকভাবে চাপ প্রয়োগের কথা। গেউলার কাছে সে চাইল এক পট কালো কফি এবং শুভকামনা। প্রত্যুত্তরে গেউলার ঠোঁটে ফুটল তিক্ত হাসি। তার চোখ দুটো ঝিমানো, কারণ অনেক চেষ্টা করে সে একটু ঘুমিয়েছিল, কিন্তু এটকিন তাকে কাঁচাঘুম থেকে ডেকে তুলেছে। সে কাপড় পাল্টে ফিরতে ফিরতে নেমে গেল রাত— উত্তপ্ত, কালো এবং ভ্যাপসা।

০৩.

ভ্যাপসা, উত্তপ্ত এবং কালো রাত্রি নেমে এল কিবুজে, ঝুলে রইল ধূলি-ধূসরিত সাইপ্রেস ঝোপের গায়ে, ঢেকে ফেলল বাগানের সৌন্দর্যবর্ধক ঝোপগুলোকে। মালিরা তৃষ্ণার্ত বাগানে পানি ছিটায় কিন্তু মাটি তা মুহূর্তের মধ্যেই গিলে ফেলে, সম্ভবত ঘাসের গোড়ায় পৌঁছানোর আগেই পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে যায়। বন্ধ অফিসঘরের মধ্যে একটা ফোন বিরক্তিকর শব্দে বেজে চলে। বাড়িগুলোর দেয়াল থেকে স্যাঁতসেতে ভাপ উঠছে। রান্নাঘরের চিমনির ধোঁয়া খাড়াভাবে বর্শার ফলার মতো উঠে যাচ্ছে যেন আকাশের হৃৎপিণ্ডকে ফুটো করতে; কারণ মৃদুতম বাতাসও অনুপস্থিত। পিচ্ছিল সিঙ্ক থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। একটা থালা ভেঙে কারো হাত কেটে গেছে। একটা নধর পোষা-বিড়াল সাপ কিংবা টিকটিকি মেরে শিকারকে ফেলে রেখেছে কংক্রিটের উপর। কোনো একটা গ্যারেজে একটা পুরনো ট্রাক্টর স্টার্ট নিয়ে কাঁপতে শুরু করল, ধোঁয়া ছাড়ল, অবশেষে বিকট শব্দে রাতের খাবার নিয়ে রওয়া দিল দ্বিতীয় শিফটের লোকদের জন্য যারা কাজ করছে দূরের ফসলক্ষেত্রে। গেউলা দেখল ইরানি লাইলক গাছের পাশে পরিত্যক্ত একটা গ্রিজের বোতল। কয়েকবার লাথি মেরে সে বোতলটি সরিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু তার লাথির ফলে উল্টো বোতলটা আরো দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেল গোলাপঝোপের মাটিতে। একটা বড় পাথর ছুঁড়ল সে বোতলটা লক্ষ্য করে। লাগল না। মেয়েটি, গেউলা, বেসুরো শিস দিয়ে উঠল।

গেউলার বয়স ঊনত্রিশ বছর। ছোটখাট প্রাণবন্ত মেয়ে। এখনো বিয়ের বর জোটাতে না পারলেও আমরা কেউই তার গুণের কথা অস্বীকার করতে পারি না। বিশেষ করে সে স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে খুবই নিবেদিতপ্রাণ। তার চেহারা ফ্যাকাশে এবং পাতলা। কড়া কফি বানানোতে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের এলাকায় নেই। আমরা বলতাম, মরা মানুষ জেগে উঠবে এমন কড়া কফি তার। তার চিবুকের দুই দিকে দুটি তিক্ততাজনিত খাঁজ।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়, আমরা যখন দল বেঁধে কোনো বাড়ির লনে বসে আড্ডা দিতাম, জোকস বলতাম—শুনতাম—হাসিতে ফেটে পড়তাম, সিগারেটের ধোঁয়ায় মেঘ তৈরি করে গান গাইতাম স্বর্গীয় আনন্দে, গেউলা কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকত না। সে নিজের ঘরে বসে আমাদের জন্য তৈরি করত জিভপোড়ানো কড়া কফি। কফি তৈরি শেষ না-হওয়া পর্যন্ত সে আড্ডায় যোগ দিত না। সেইসঙ্গে তীক্ষ্ণ নজর রাখত যাতে আমাদের জন্য বিস্কুটের ঘাটতি না পড়ে।

গেউলা এবং আমার মধ্যে কী ঘটেছিল তা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। আমি শুধু একটা বা দুটো সূত্র ধরিয়ে দিতে পারি। অনেক আগে, প্রায় প্রতিসন্ধ্যায় গেউলা আর আমি উদ্যানগুলোতে একসঙ্গে পায়চারি করতাম। আসলে গল্প করতাম। এটি

অনেক আগের কথা এবং অনেক আগেই এটি বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা রাজনৈতিক আদর্শ অথবা সদ্যপ্রকাশিত বই নিয়ে কথা বলতাম। গেউলা ছিল অনমনীয় এবং কখনো কখনো নির্দয় সমালোচক। আমি ছিলাম সংশয়ে আচ্ছন্ন। সে আমার লেখা গল্প পছন্দ করত না, কারণ সেগুলোতে পরিবেশ, দৃশ্যপট এবং চরিত্রের বর্ণনায় থাকত বড় বেশি মেরুকরণ। সাদা-কালোর মাঝখানে কোনো মধ্যবর্তী ছায়া থাকত না। আমি হয় ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা চাইতাম অথবা অস্বীকার করতাম। কিন্তু গেউলার কাছে সবসময়ই তাৎক্ষণিকভাবে যুক্তি প্রমাণের মতো রসদ থাকত। তাছাড়া তার চিন্তাপ্রণালীও খুব সুশৃঙ্খল। মাঝে মাঝে আমি সাহস করে আপোসের ভঙ্গিতে তার কাঁধে হাত রাখতাম এবং তার শান্ত হবার জন্য অপেক্ষা করতাম। বড়জোর একবার কি দুইবার সে আমার গায়ে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে।। সবসময়ই সে তার ছেঁড়া স্যান্ডেল কিংবা মাথাব্যথার কথা বলত। সুতরাং আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। এখনো সে অবশ্য পত্রিকা থেকে আমার ছাপা হওয়া গল্পগুলো কেটে কেটে তার আলমারির একটা ড্রয়ারে সংগ্রহ করে রাখে।

আমি তার প্রত্যেক জন্মদিনে একটা করে নতুন কবিতার বই উপহার দেই। আমি তার ঘরে ঢুকি তখনই, যখন সে ঘরে থাকে না। বইটা রেখে চলে আসি। বইতে কোনো উপহারবাণী লিখি না কখনোই। মাঝে মাঝে খাবারঘরে আমরা একসঙ্গে বসি। আমি তার চোখের দিকে তাকানোর ব্যাপারটা এড়িয়ে চলি যাতে তার দুঃখের ছায়া দেখতে না হয়। উত্তপ্ত দিনে তার মুখ ঘামে ভিজে যায়, তার চিবুকের ব্রণগুলো লাল হয়ে যায়, মনে হয় তার কোনো আশা নেই। শীতকালে দূর থেকে তাকে দেখলে মাঝে মাঝে সুন্দরী মনে হয়। এই ঋতুতে গেউলা খুব ভোরে বাগানে বেড়াতে পছন্দ করে। সে একাই বাগানে যায় এবং একাকী ফিরে আসে। কখনো কোনো কোনো যুবক আমাকে জিগ্যেস করে গেউলা কী খুঁজতে যায় সেখানে। জিগ্যেস করার সময় তাদের মুখে থাকে বিদ্বেষের চাপা হাসি। আমি তাদের বলি যে আমি জানি না। এবং সত্যিই আমি জানি না।

০৪.

রেগে গিয়ে গেউলা আরেকটা পাথর ছুঁড়ল। এবার তার লক্ষ্য ব্যর্থ হল না। কিন্তু কাচভাঙার যে শব্দ শোনার জন্য সে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সেটা শোনা গেল না। পাথরটা বোতলের গায়ে লেগে ছিটকে গিয়ে ঢুকল একটা ঝোপের মধ্যে। তৃতীয় পাথরটি, আগের দুটির চেয়ে বড় এবং ভারি, ছোঁড়া হল আরো কাছ থেকে এবং খুব জোরের সাথে। কিন্তু গতিজড়তার কারণে গেউলাও ভারসাম্য হারিয়ে টলতে টলতে গিয়ে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ঠিক বোতলটির ওপরে। এই সময় ঘটল একটা খসখসে শুকনো বিস্ফোরণ— বিরামহীন। নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসছে বোতলের ভেতরের বস্তু।

ভ্যাপসা, কালো এবং উত্তপ্ত রাত। তাপ যেন ভাঙা কাচের মতো বিঁধছে চামড়ায়। গেউলা পা টেনে তুলল, ব্যালকনি দিয়ে হেঁটে নিজের ঘরে ঢুকল, স্যান্ডেল ছুঁড়ে ফেলল পা থেকে, তারপর নিচে নেমে হেঁটে চলল ধুলোমাখা পথে, খালি পায়ে।

শক্ত মাটি তার পায়ের তলায় বিঁধছিল। এই ছোট্ট কষ্টটি তার স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করছিল বরং। বাগান পর্যন্ত আলো আছে। তারপরে পাথুরে পাহাড়ের গাঢ় ছায়া অপেক্ষা করছিল তার জন্য। কিসের প্রতিজ্ঞায় কে জানে, তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে বাগানের বেড়ার ফাঁক বড় করে তার মধ্যে নিজেকে গলিয়ে দিল। এই সময়েই খুব মৃদু সান্ধ্যবাতাস বইতে শুরু করেছে। গ্রীষ্মের তপ্ত বাতাস। কোন দিক থেকে বইছে বোঝা যায় না। বৃদ্ধ সূর্যটি পশ্চিমে ধুলোর দিগন্তের আড়ালে। দূরের ক্ষেতে শ্রমিকদের রাতের খাবার পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলো সর্বশেষ ট্রাক্টর। এই ট্রাক্টরই দ্বিতীয় শিফটের শ্রমিকদের পৌঁছে দিয়েছে। ট্রাক্টরটা যেন আচ্ছাদিত হয়ে আছে ধোঁয়ায় কিংবা গ্রীষ্মের উত্তাপে।

গেউলা নিচু হয়ে মাটি থেকে কয়েকটি ঢিল তুলে নিল। আবার অন্যমনস্কভাবে একের পর এক সেগুলো নিক্ষেপ করল পেছনের দিকে। তার ঠোঁটে উচ্চারিত হচ্ছিল কবিতার পঙ্‌ক্তি। কয়েকটি তার প্রিয় তরুণ কবিদের লেখা, বাকিগুলো নিজের। সেচের পাইপের কাছে এমনভাবে নিচু হয়ে সে পানি খেল, যেন চুম্বন করছে নলটাকে। কিন্তু এটাতে মরচে ধরা, লোহার পাইপ তখনো গরম, আর পানিটা দুর্গন্ধযুক্ত। সে মাথা নিচু করল পাইপের সামনে। পানিতে ভিজে গেল তার কাঁধ, তার মুখ, পানি ঢুকল তার জামার মধ্যে। মরচে আর কাদার তীক্ষ্ণ কটু স্বাদে তার গলা বিস্বাদ হয়ে গেল। সে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে। কোনো উপশম নেই। সম্ভবত এককাপ কফি পেলে ভালো লাগবে। কিন্তু তার জন্য তাকে বাগান পেরুতে হবে। এক্ষুণি যাওয়া দরকার।

০৫.

বাগানগুলো বৃক্ষে এবং সৌরভে পরিপূর্ণ। ডালগুলো বেঁকে বেঁকে উঠে গেছে উপরের দিকে, যেন এক-একটা গম্বুজ। রোদ সরাসরি কম লাগে বলে, প্রতিদিন পানি ছিটানো হয় বলে, পায়ে চলা পথগুলো ভেজা ভেজা। এক গাছের ছায়া পৌঁছে গেছে আরেক গাছের গোড়া পর্যন্ত। গেউলা একটা প্লাম তুলে নিয়ে তালুতে রেখে চাপ দিল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো আঠালো রস। এই অনুভূতি তাকে শিহরিত করে। সে শ্বাস টানল বড় করে। এবার আরেকটি প্লাম চ্যাপ্টা করল। আরেকটি প্লাম নিয়ে সে নিজের গালে ঘষতে শুরু করল। ঘষে চলল যতক্ষণ-না সেটা ফেটে রস বেরিয়ে গাল মাখামাখি হয়। এবার সে হাঁটু গেড়ে বসে একটা ছড়ি দিয়ে ধুলোয় আঁকিবুকি কাটতে শুরু করল। উদ্দেশ্যহীন রেখা। কোণ। গম্বুজ। দূর থেকে ভেসে এলো ছাগলের ডাক। খুব ক্ষীণ ঘণ্টার ধ্বনি শুনে সন্ত্রস্ত হল সে। যেন সে নিজের এলাকা থেকে অনেক দূরে আছে!

যাযাবর লোকটি এসে দাঁড়াল গেউলার পেছনে। ভূতের মতো নিঃশব্দে। সে বুড়ো আঙুল দিয়ে ধুলোতে গর্ত খুঁড়ছে। লম্বা ছায়া পড়েছে তার সামনে। কিন্তু গেউলা যেন শব্দবন্যার কারণে অন্ধও হয়ে গেছে। সে দেখছে না কিছু, শুনছে না কিছু। সে বসে আছে হাঁটুতে ভর দিয়ে আর হাতের ডাল দিয়ে আঁকিবুকি কেটে চলেছে ধুলোয়। যাযাবর অপেক্ষা করছে অপরিসীম ধৈর্যের সাথে, আগের মতোই নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে তার ভালো চোখটির পাতা বুঁজে যাচ্ছে। তখন সে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকছে অন্ধ চোখ মেলে। অবশেষে সে বেরিয়ে এল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ কৃতজ্ঞতার কুর্ণিশ জানাল। তার অনুগত ছায়াটিও ধুলোর উপরে নড়া-চড়া করল অনুরূপভাবে। গেউলা উঠে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা লাফে একটা গাছের গায়ে হেলান দিল। অল্প শব্দ উঠল বাতাসে, যাযাবরটির কাঁধ ঝুলে গেল, ঠোঁটে ফুটল হাসি। গেউলা হাত তুলে ডাল দিয়ে বাতাসে ছুরি চালানোর ভঙ্গি করল। যাযাবর তখনো হাসছে। তার চোখ পড়ল গেউলার নগ্ন পায়ে। শান্ত কণ্ঠে বিনম্র হিব্রুতে কথা বলল সে— এখন কয়টা বাজে?

আরবের হাসিটা চওড়া হল আরেকটু। একটা ছোট্ট বো করল সে যেন কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে— অনেক ধন্যবাদ মিস।

তার পায়ের নগ্ন বুড়ো আঙুল ততক্ষণে ভ্যাপসা মাটিতে মোটামুটি বড় গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে। মাটির দুই-একটা ঢেলা উপরে উঠছে পা বেয়ে, যেন ওগুলোর মধ্যে কচ্ছপের বাচ্চা লুকিয়ে আছে।

গেউলা তার ব্লাউজের সবচেয়ে ওপরের বোতামটাও আটকে নিল। জোরে জোরে নিশ্বাস নেওয়ার কারণে তার বুক ফুলে উঠছে; ফলে তা যথেষ্ট দৃষ্টি-আকর্ষক। তার এমন ঘাম ছুটছে! মনে হচ্ছে সে নিজের ঘামের গন্ধ পাচ্ছে। ফুলে ফুলে উঠছে তার নাকের পাটা। যাযাবর তার নষ্ট চোখটা বুঁজে তার দিকে তাকাল। তার ভালো চোখটার পাতা পিটপিট করছে। তার চামড়ার বর্ণ গাঢ়, খুব সতেজ এবং উষ্ণ। কণ্ঠার কাছে গভীর খাঁজ। লোকটা গেউলার দেখা পুরুষদের চেয়ে আলাদা। তার শরীরের রং, গন্ধ এবং শ্বাস নেবার ভঙ্গিও অন্যদের থেকে আলাদা। তার নাকটা সরু, লম্বা, নাকের নিচে গোঁফের রেখা। গালদু'টো বসে গেছে। তার ঠোঁট মেয়েদের চেয়েও পাতলা। কিন্তু চিবুক দৃঢ়, যেন বিদ্রোহ কিংবা অস্বীকারের চিহ্ন ধারণ করে আছে।

গেউলা নিজেকে বলে, লোকটা বিকর্ষক-হ্যান্ডসাম। নিজের অজান্তেই তার ঠোঁটে ফুটে ওঠে হাসির আভাস, লোকটার স্থায়ী হাসির প্রত্যুত্তরে। বেদুঈন তার বেল্টের লুকানো পকেট থেকে দুইটি ভাঙা সিগারেট বের করে এক হাতের প্রসারিত তালুতে এমনভাবে ধরে যে মনে হয় সে চড়ুইপাখির জন্য রুটির টুকরো মেলে রেখেছে। গেউলা নিজের হাসিটা মুছে ফেলে, দুইবার মাথা ঝাঁকায় এবং একটা সিগারেট

গ্রহণ করে। সে সিগারেট নিজের হাতে নিয়ে সেটাকে মসৃণ করে, ভাঁজগুলো দূর করে সুন্দরভাবে রোল করে। তারপরে ঠোঁটে তোলে। বিদ্যুৎগতিতে, লোকটার নড়ে ওঠার কারণ বুঝে ওঠার আগেই সে দেখতে পায় তার মুখের সামনে একটা ছোট্ট শিখা নাচানাচি করছে। গেউলা দুইহাতে লাইটারটাকে বাতাস থেকে আড়াল করে, যদিও বাতাস নেই। সে চোখ বন্ধ করে যেন শিখাটাকে নিজের মধ্যে শুষে নেয়। যাযাবর নিজের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে আবার নম্রভাবে বো করে।

—'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ'। মসৃণ কণ্ঠে বলে যাযাবর।

—'ধন্যবাদ', গেউলা উত্তরে বলে— 'ধন্যবাদ'।

—'আপনি কি কিবুজে থাকেন?'

গেউলা মাথা নাড়ে।

—'ভা-লো', ঝকঝকে দাঁতের ফাঁক দিয়ে প্রলম্বিত শব্দটি বেরিয়ে আসে— 'খুব ভালো'।

—গেউলা তার মরু-আলখাল্লার দিকে তাকায়—'এরকম কাপড় পরে থাকলে খুব গরম লাগে না?'

—লোকটা বিভ্রান্ত চোখে তাকায়, মুখের হাসিটা অপরাধীর মতো। যেন হাতে-নাতে ধরা পড়েছে চুরি করতে গিয়ে। সে একটা ধাপ পিছিয়ে যায়।

—'খোদার কসম, গরম নয়। সত্যিই গরম নয়। কেন? বাতাস আছে, আকাশ আছে'... কথা খুঁজে না পেয়ে সে থেমে যায়।

গাছের ডগাগুলোতে আরো অন্ধকার নেমেছে। একটা শেয়াল প্রথমে রাত্রির আগমনবার্তা ঘোষণা করে। তারপরে একটা ক্লান্ত পেঁচা। পুরো বাগানজুড়ে ছোট ছোট নরম পায়ের শব্দ শোনা যায়। হঠাৎ গেউলা সচেতন হয়। কালো ছাগলগুলো তাদের মালিককে খুঁজছে। তারা ফলগাছগুলোর আনাচে-কানাচে হেঁটে বেড়াচ্ছে। গেউলা আশ্চর্য হয়ে ঠোঁট গোল করে শিস দিয়ে উঠল— 'যাকগে, তুমি এখানে কী করছিলে? চুরি?'

যাযাবর এতটাই ভীত হয়ে পড়ল যেন তার মুখে কেউ পাথর ছুঁড়ে মেড়েছে। সে নিজের বুকে হাত রাখল— 'না চুরি নয়, খোদার কসম, সত্যি চুরি নয়।' সে নিজের ভাষায় লম্বা করে দিব্যি করল। তারপর নিঃশব্দ হাসির সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল। তার নষ্ট চোখটা কেঁপে উঠল নার্ভাসভাবে। এরমধ্যেই একটা ছাগল এসে তার আলখাল্লার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। সে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিল ছাগলটাকে আর আবেগের সাথে শপথ করে বলতে লাগল বারবার— 'না চুরি নয়, সত্যি বলছি আল্লার কসম! চুরি করা নিষেধ।'

—'বাইবেলের নিষেধ।' গেউলা শুকনো, কঠোর হাসির সাথে বলল— 'চুরি করা নিষেধ, খুন করা নিষেধ, পরের ধনে লোভ করা নিষেধ, অপরাধ করা নিষেধ। অপরাধহীনতা সন্দেহের ঊর্ধ্বে।'

গেউলার কথার তোড়ে যাযাবর আবারও ভীত হয়ে পড়েছে। সে চোখ নামিয়ে তাকিয়ে রইল মাটির দিকে। লজ্জিতমুখে পা দিয়ে অনবরত মাটি খুঁড়ছে। যেন নিজেকে স্থির রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তার নষ্ট চোখটা সরু হয়ে গেছে। গেউলা এক মুহূর্তের জন্য সতর্কতার কথা ভাবল। এটা নিশ্চয়ই একটা সংকেত। বেদুঈনের মুখ থেকে মুছে গেছে হাসি। সে কথা বলল নরম ফিসফিসানির সাথে, যেন প্রার্থনামন্ত্র আওড়াচ্ছে— 'সুন্দরী মেয়ে! তুমি সত্যিই খুবই সুন্দর মেয়ে। আমি এখনো কোনো মেয়েমানুষ পাইনি। আমি এখনো যুবক। তবুও এখনো কোনো মেয়েমানুষ নাই। আহ!' সে কথাগুলো বলল একটা ছাগলের দিকে তাকিয়ে, যে ছাগলটা সামনের দুই পা উঁচু করে আঁকড়ে ধরেছে একটা গাছের কাণ্ড, পাতা খাচ্ছে সেই গাছের। একবার ছাগলটা চোরাচোখে, চকিতে মনিবের দিকে তাকাল, দাড়ি ঝাঁকাল, তারপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিল পাতা চিবুনোর কাজে।

কোনো রকম পূর্বসংকেত ছাড়াই, রাখাল বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে ছাগলের পেছনের দুই পা ধরে ফেলল, তাকে শূন্যে তুলল মাথার উপর, নির্দয়ভাবে আছড়ে ফেলল মাটিতে। থুথু ফেলল, তারপর মেয়েটার দিকে ফিরল—
'পশু তো।' সে ক্ষমা প্রার্থনা করল— 'পশু। কী আর করা যাবে। মাথায় ঘিলু নেই। জানে না সভ্যতা-ভব্যতা।'

যে গাছটির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা থেকে পিঠ সরিয়ে গেউলা একটু ঝুঁকে দাঁড়াল বেদুঈনের দিকে। তার পিঠ বেয়ে নেমে গেল একটা মিষ্টি কাঁপুনি। কিন্তু তার গলা তখনো শুকনো এবং ঠাণ্ডা— 'আরেকটা সিগারেট?' সে জানতে চাইল— 'তোমার কাছে আরেকটা সিগারেট হবে?'

বেদুঈন মনঃকষ্ট ও হতাশার সঙ্গে মাথা নাড়ল। ক্ষমা চাইল। সে জানাল তার কাছে আর সিগারেট নেই, এমনকি একটিও নেই, এমনকি একটা টুকরাও নেই। আর নেই। শেষ হয়ে গেছে। কী দুঃখের কথা! গেউলাকে আরেকটা দিতে পারলে সে খুবই খুশি হত, কিন্তু আর নেই। সবক'টি শেষ হয়ে গেছে।

মার-খাওয়া ছাগলটা তখনো চারপায়ে শক্ত করে দাঁড়াতে পারছে না। ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে সে ফের ফিরে গেল গাছটির কাছে, চোখের কোণ দিয়ে দেখল মালিককে। তারপরে দুই পা দিয়ে কাণ্ডটাকে পেঁচিয়ে পাতাতে মুখ দিল। রাখাল নিঃসাড় দাঁড়িয়ে দেখছিল। এবার সে তুলে নিল একটা ভারি পাথর। বন্য ক্রোধের সাথে ছোঁড়ার উদ্যোগ নিচ্ছে। গেউলা তার হাত চেপে ধরল— 'যেতে দাও। ছাগলটা পাতা খাচ্ছে, খাক। ওটা তো কিছুই বোঝে না। ওটা তো একটা পশু। নিছক পশু। মাথায় ঘিলু নেই। জানে না সভ্যতা-ভব্যতা।'

যাযাবর তার কথা মেনে নিল। মেনে নেবার চিহ্ন হিসেবে হাতের পাথরটা ফেলে

দিল। তখন গেউলাও ছেড়ে দিল তার হাত। লোকটা আবার তার বেল্ট থেকে লাইটার বের করল। সরু আঙুলগুলো লাইটার নিয়ে লোফালুফি করল কিছুক্ষণ। হঠাৎ লাইটার জ্বলে ওঠায় সেটিতে ফুঁ দিল নিভিয়ে ফেলার জন্য। বাতাস পেয়ে শিখাটি একটু চওড়া হল। তারপর নিভে গেল। কাছাকাছি একট শেয়াল তীক্ষ্ণ কর্ণচ্ছেদী কণ্ঠে বিলাপ করে উঠল। আগেরটার দেখাদেখি পালের বাকি ছাগলগুলোও গাছটির কাছে গিয়ে পাতা চিবুচ্ছে।

যাযাবরদের তাঁবুর দিক থেকে দক্ষিণে ছুটে এল বিলাপের মতো ক্ষীণ সুর। ক্ষীণ দফের শব্দ সময়কে ডাকতে শুরু করল অলসভঙ্গিতে। ধূলি-মলিন মানুষগুলো বসেছে ক্যাম্পফায়ার ঘিরে। দফের উত্থান-পতনহীন একই লয়ের সুর ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশে। রাত এখন সমস্ত বোঝা ও চাপ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। পূর্বদিকে অনেক দূরে সর্বশেষ আলোর শিখা নিভন্ত। বাগানটি ঢেকে গেছে অন্ধকারে। চারপাশে রাতের অন্যরকম শব্দ— বাতাসের ফিসফিসানি, ছাগলের পাতা চিবানোর মসমস শব্দ, ঝরাপাতার মাটিঘেঁষে উড়ে যাওয়ার খসখস শব্দ। গেউলা ঠোঁট গোল করে শিস দিয়ে পুরনো দিনের সুর তুলল। যাযাবর শুনল প্রচণ্ড একাগ্রতা নিয়ে। তার মাথা একদিকে হেলে পড়েছে বিস্ময়ে। মুখটা অল্প একটু হা। গেউলা ঘড়ির দিকে তাকাল। তার ঘড়ির ফসফোফ্লোরোসেন্ট ডায়াল ঝিকিয়ে উঠল। রাত্রি।

আরব লোকটি গেউলার দিকে পেছনে ফিরে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল, কপাল ঠেকাল মাটিতে, বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ল আন্তরিকভাবে।

—'তুমি এখনো কোনো নারীর সান্নিধ্য পাওনি?' গেউলা তার প্রার্থনার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

—'তুমি এখনো যুবক', গেউলার কণ্ঠ আশ্চর্যজনকভাবে উঁচু। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস এখনো নিয়মিত। লোকটা প্রার্থনা বন্ধ করে মুখটা তার দিকে ফেরাল, একটি আরবি প্রবাদ উচ্চারণ করল।

—'তুমি এখনো যুবক'— গেউলা আবার বলল— 'একেবারে যুবক। হয়তো-বা কুড়ি। হয়তো-বা ত্রিশ। যুবক। তোমার এখনো কোনো মেয়েমানুষ নেই। একেবারে যুবক।'

লোকটা লম্বা মন্তব্যসহ উত্তর দিল নিজের ভাষায়। গেউলা নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল। তার হাত নিজের পেছনে।

—'ব্যাপারটা কী?' গেউলা হাসতে হাসতে জিগ্যেস করল— 'তুমি হঠাৎ করে আরবি বলা শুরু করলে কেন? তুমি আমাকে কী মনে করো? তুমি এখানে চাও কী?'

এবারও যাযাবর উত্তর দিল নিজের ভাষায়। এখন তার কণ্ঠস্বর কী এক শংকায় আচ্ছন্ন। খুব ধীর ভঙ্গিতে সে উঠে দাঁড়াল যেন সে মুমূর্ষু জীব। গেউলা এখন শ্বাস

নিচ্ছে গভীরভাবে, সারা শরীরে মৃদু কাঁপুনি। রাখালের গলা দিয়ে একটা বিদঘুটে শব্দ বেরুল। ছাগলদের জন্য সংকেত। ছাগলরা সাড়া দিল তৎক্ষণাৎ। সবাই ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়াল রাখালকে। তাদের ছুটে আসার সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেল ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। ঘন কালো ছাগলের সারিটা তাদের রাখালসহ আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল। একসময় হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

তারপরে, একাকী এবং কম্পমান গেউলা দেখল অন্ধকার আকাশ চিরে একটা বিমান যাচ্ছে। গাছপালার উপরে বিমানের আলো একটার পর একটা জ্বলছে, নিভছে। এই জ্বলা-নেভাও দফের শব্দের মতোই ছন্দোময়— লাল, সবুজ, লাল। রাত নেমেছে সবদিকে। বাতাসে অল্প ধুলোর গন্ধ ভেসে আসছে। শুধু গাছগুলোর কাছ দিয়ে বইছে বাতাস। হঠাৎ ভীতি আঁকড়ে ধরল গেউলাকে। তার রক্ত ঠাণ্ডা। জমে গেছে যেন ভয়ে। চিৎকার করার জন্য তার মুখটা হা হল, কিন্তু সে চিৎকার করল না। বরং দৌড়াতে শুরু করল— খালি পায়ে কিন্তু সর্বশক্তিতে। ঘরের দিকে। কিন্তু ঝিঁঝিঁর ডাক তার পিছু ছাড়ল না।

০৬.

গেউলা ঘরে এসে সেক্রেটারিয়েট সদস্যদের জন্য কফি বানাল। এটকিনকে সে এই কফি সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আগেই। বাইরের আবহাওয়া তখন একটু ঠাণ্ডা হয়েছে কিন্তু তার ঘরের দেয়ালগুলো গরম এবং তার শরীরে তো আগুন জ্বলছেই। তার কাপড় সেঁটে আছে শরীরের সঙ্গে, কারণ খুব জোরে ছুটে আসা। তার মুখের দাগ ও ফুটকিগুলো জ্বলজ্বল করছে। সে দাঁড়িয়ে গুণতে শুরু করে কফির পানি মোট কতবার ফুটেছে। সাতবার। সাতবার পানি ফুটাতে হবে। তার ভাই এসব শিখিয়েছিল তাকে। মরুভূমিতে জাতিগত যুদ্ধে মারা গেছে ভাইটা। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে গুণছে, কালো তরল পদার্থটা একবার বলকে উঠছে, নেমে যাচেছ, বলকে উঠছে, নেমে যাছে। ফুটছে টগবগ করে।

যথেষ্ট হয়েছে। এখন গোসল করতে হবে। বাইরে যাওয়ার জন্য পরিষ্কার কাপড় পরতে হবে। এটকিন আর বর্বরদের সম্পর্কে কতটুকু জানে! এটকিন নিবেদিতপ্রাণ সোস্যালিস্ট। সে বেদুঈনদের সম্পর্কে কতটুকুই-বা জানে! যাযাবররা দূর থেকেই দুর্বলতার গন্ধ টের পায়। তুমি তার সঙ্গে একটু দয়ালু ব্যবহার করো, অথবা তার দিকে তাকিয়ে হাসো, সঙ্গে সঙ্গে সে তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তোমাকে ধর্ষণ করতে চাইবে। ঠিক যে রকম আজ আমি পালিয়ে বেঁচেছি।

বাথরুমের ড্রেনের মুখে কিছু একটা আটকেছে। ভেতরে পানি জমে যাচ্ছে। টুলটাও পিচ্ছিল। গেউলা তার পরিষ্কার কাপড়গুলো পাথরের স্লাবে রাখল। আমি যে কাঁপছি তার কারণ এই নয় যে পানিটা ঠাণ্ডা। আমি কাঁপছি ক্ষোভে। তার ওই

কালো আঙুলগুলো কিভাবে আমার গলা টিপে ধরতে এগিয়ে আসছিল। আর লোকটার দাঁতগুলো! ছাগলগুলো। ছোট-খাট, চামড়া মোটা— ঠিক শিশুদের মতো, কিন্তু খুব শক্তিশালী। লোকটাকে আঁচড়ে-কামড়ে-লাথি মেরে তবেই-না আমি নিজেকে বাঁচাতে পেরেছি! পেটে আর সারা শরীরে সাবান ঘষতে হচ্ছে। বারবার সাবান ঘষতে হচ্ছে। হ্যাঁ আমাদের যুবকরা আজ রাতেই বেদুঈনদের তাঁবুতে হামলা করুক, ওদের কালো হাড়গুলো গুঁড়ো করে দিক। আমার সাথে লোকটা যা করল! এখন অবশ্যই আমাকে বাইরে বেরুতে হবে।

০৭.

গেউলা বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরের দিকে চলল। কফি নিয়ে সেক্রেটারিয়েটে যেতে হবে। কিন্তু হঠাৎ ঝিঁঝিঁ-র ডাক আর হাসির শব্দ! তার মনে পড়ল সেই লোকটার কথা যে জানু পেতে প্রার্থনা করছিল। তার মনে সতর্কসংকেত বেজে উঠল। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়ল নিঃশব্দে। হঠাৎ তার বুক ঠেলে বমি উঠে এল। এবং সে কাঁদতে শুরু করল। এবার তার হাঁটুর শক্তি নিঃশেষ। সে অন্ধকার মাটিতে বসে পড়ল। ধীরে ধীরে তার কান্না থামল। কিন্তু তার দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে ঠকঠক করে, ঠাণ্ডায় অথবা আত্মকরুণায়। হঠাৎ তার মন থেকে তাড়াহুড়ো করার চিন্তা উধাও হয়ে গেল। এমনকি কফির ব্যাপারটিকেও এখন আর গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না। নিজেকে সে মনে করিয়ে দিচ্ছে— এখনো সময় আছে। এখনো সময় আছে।

ওই বিমানগুলো রাতের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। আজ রাতে সম্ভবত বোমাবর্ষণের মহড়া হবে। বার বার গর্জন করে উঠছে ইঞ্জিনের শব্দ, আলো জ্বলছে-নিভছে অবিরাম। লাল, সবুজ, লাল, সবুজ, লাল। বিপরীত দিক থেকে ভেসে আসছে যাযাবরদের গান আর দফের শব্দ, যেন নিরন্তর, এক এক দুই এক, এক, দুই। এবং নৈঃশব্দ্য।

০৮.

গেউলার জন্য সাড়ে আটটা থেকে নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমরা। নয়টা বাজার পাঁচ মিনিট আগে এটকিন বলল যে সে কল্পনাও করতে পারেনি এমনটি ঘটতে পারে। সে মনেই করতে পারছে না গেউলা কখনো দেরিতে মিটিংয়ে এসেছে। যাহোক আমাদের এখন উচিত মিটিং শুরু করা এবং এজেন্ডাগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া।

সে ঘটনার একটা সারমর্ম তুলে ধরল। বেদুঈনদের দ্বারা আমাদের যেসব ক্ষতি হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ উপস্থিত করল, তবে সঙ্গে এটাও জানাতে ভুলল না যে বেদুঈনদের সঙ্গে সুরাহা করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সেগুলোর কথাও তুলে ধরল। সে শুভেচ্ছা আদান-প্রদান আবেদনের কথাও বলল। পুলিশ

ডাকার কথা, সেটলমেন্টে পাহারাদারের সংখ্যা বাড়ানো, শিকারি কুকুর মোতায়েন, গোত্রপ্রধানের সঙ্গে আলোচনা— সব কথাই সে খুলে বলল। তবে তাকে স্বীকার করতে হল যে আমরা একটা অচলাবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছি। তারপরেও, সে মনে করে আমাদের পদক্ষেপ ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া উচিত। চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে না-পড়াটাই উচিত, কেননা ঘৃণা শুধু আর একটা ঘৃণারই জন্ম দিতে পারে। শত্রুতার বিষাক্ত বলয়কে ছিন্ন করা জরুরি প্রয়োজন। সেই কারণেই সে যুবকদের প্রস্তাবের সর্বাত্মক বিরোধিতা করেছে। উপসংহারে সে আমাদের মনে করিয়ে দিতে চায় যে নতুন বসতিস্থাপনকারীদের সঙ্গে ভূমিপুত্রদের বিরোধের সূত্রপাত সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই, যার উদাহরণ রয়েছে কেইন-এর গল্পে, যে দাঁড়িয়েছিল তার ভাই আবেল-এর বিপক্ষে।

আমরা সমাজ পরিচালনার যে নীতিমালা গ্রহণ করেছি তার ভিত্তিতে এই পুরনো গৃহযুদ্ধের ইতি টানতে হবে, যেমনভাবে আমরা আমাদের অনেক আদিম কুসংস্কার ও প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়েছি। এখন সবকিছুই নির্ভর করছে আমাদের নৈতিক শক্তি বা নৈতিকতার ওপর।

সভায় টান টান উত্তেজনা, এমনকি একটু অস্বস্তিও। রামি বারদুয়েক এটকিনের বক্তব্যে বাধা দিতে চেয়েছে। সবাইকে শুনিয়ে এটকিনের বক্তব্যকে বলেছে— 'রাবিশ'। এটকিনও উত্তেজিত হয়েছে; তরুণ সদস্যদের 'সন্ত্রাসবাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন' বলে আখ্যায়িত করেছে এবং সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে আমরা এখানে ওই ধরনের কোনো কিছু ঘটাতে যাচ্ছি না।

গেউলা আসেনি। এর অর্থ হচ্ছে মিটিং-এর উত্তেজনা প্রশমনকারী মূল ব্যক্তিটিই অনুপস্থিত। সেই সাথে অনুপস্থিত কফি। রামির সঙ্গে আমার বাদানুবাদ উত্তপ্ত হতে হতে ফেটে পড়ল। বয়সে ওদের সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও আমি যুবকদের প্রস্তাবে একমত নই। এটকিনের মতো আমিও যাযাবরদের সঙ্গে অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতে রাজি নই দুইটি কারণে। আমি যখন সভায় কথা বলার অনুমতি পেলাম, তখন দুইটি কারণই তুলে ধরলাম। প্রথম কারণ হচ্ছে— কিছু ঘটনা ঘটেছে বটে, তবে সেগুলো মারাত্মক নয়। কিছু ছিঁচকে চুরির ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। একটা নল, কিংবা একজোড়া প্লায়ার্স যা হয়তো ট্রাকের ড্রাইভার ফেলে গেছে মাঠে, কিংবা গ্যারেজ থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করা হয়েছে বেদুঈনদের নামে। দ্বিতীয়ত, হত্যা বা ধর্ষণের মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। একথায় রামি উত্তেজনায় ফেটে পড়ে জিগ্যেস করল, আমি সে সবের জন্যেই অপেক্ষা করছি কিনা। আমি কি ধর্ষণের কোনো ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছি যা নিয়ে গেউলা কাব্য রচনা করতে পারে, অথবা আমি লিখতে পারি ছোট গল্প? আমি ক্ষেপে গিয়ে কড়া জবাব দিতে চাইলাম।

কিন্তু এটকিন, আমাদের উত্তেজনায় হতাশ ও অপ্রস্তুত হয়ে আমাদের দুজনের

কাউকেই আর সভায় কথা বলতে দিতে রাজি নয়। বরং সে আবার নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। সে জানতে চাইল যে যখন পত্রিকায় রিপোর্ট হবে যে কিবুজের অধিবাসীরা তাদের আরব প্রতিবেশীদের হত্যার জন্য দল পাঠিয়েছে তখন সকলের কেমন লাগবে। এটকিন 'হত্যাকারীদল' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রামি তার সাঙ্গপাঙ্গদের দিকে সেই রকম ইঙ্গিত করল, যা সচরাচর বাস্কেটবল খেলোয়াড়রা করে থাকে। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র তারা একযোগে উঠে দাঁড়াল, ক্ষোভের সঙ্গে মিটিং ছেড়ে চলে গেল। ফলে এটকিন, শান্তির সপক্ষে তার অনুভূতি দ্বিতীয়বার ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেল শুধমাত্র তিনজন বৃদ্ধা এবং অনেক আগে অবসরপ্রাপ্ত একজন পার্লামেন্ট সদস্যের সামনে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে আমিও যুবকদলকে অনুসরণ করলাম। সত্যি! আমি যুবকদের সঙ্গে একমত নই। কিন্তু মিটিংয়ে আমার কথা বলার অধিকার হরণ করে আমাকে অপমান করা হয়েছে।

০৯.

শুধু যদি মিটিংয়ে গেউলা এবং তার বিখ্যাত কফি উপস্থিত থাকত, তাহলেই এই উত্তেজনা প্রশমন করা সম্ভব হত। গেউলার দক্ষতার কারণেই এই অনৈক্যের বিষয়ে একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু কফি এখনো তার ঘরের টেবিলেই। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর গেউলা নিজে এখন মেমোরিয়াল হলের ঝোপের মধ্যে শুয়ে বিমানের আলো দেখছে, রাত্রির নিজস্ব শব্দ শুনছে। সে কীভাবে ক্ষমা ও শান্তিকে প্রসারিত করতে পারে! লোকটাকে ঘৃণা করে এবং তার মৃত্যু কামনা করে? হয়তো-বা উঠে দাঁড়িয়ে, তার কাছে পৌঁছে গিরিখাত থেকে তাকে খুঁজে বের করে এবং আর ফিরে না এসে। এমনকি তাকে গান শুনিয়ে! ধারালো টুকরোগুলো তার চামড়ায় বিঁধে আছে, রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভাঙা সেই বোতলটির মধ্যে জমা হচ্ছে, যে বোতলটি সে আজ সন্ধ্যায় পাথর ছুঁড়ে ভেঙেছিল। আর ভাঙা কাচের টুকরোগুলোর পাশে, মাটির ঢেলাগুলোর মধ্যে যে জীবন্ত জিনিসটি নড়াচড়া করছে, ওটা একটা সাপ, সম্ভবত বিষধর সাপ, সম্ভবত ভাইপার। সাপটা লকলকে জিভ বের করে আছে, তার তেকোনা মাথাটি ঠাণ্ডা এবং খাড়া। চোখদুটো গাঢ় কাচের মতো। সাপ বোতলের কাছে আসতে পারে না। কারণ সাপের চোখের পাতা নেই। গেউলার মাংসের মধ্যে ঢুকে গেছে একটা কাচের টুকরা। সে এখন খুবই ক্লান্ত। কষ্টকে অপার্থিব সুখের মতো মনে হচ্ছে। দূরের কোনো কিছু তার কানে অনুরণন তুলেছে। এখন ঘুম। ভীতচোখে, অশ্রুর পর্দায় ঢাকা চোখে সে যুবকদের দলটাকে দেখতে পেল। ওরা মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে গিরিখাতের দিকে। যাযাবরদের উচিত শিক্ষা দিতে। আমাদের হাতে শক্ত, মোটা লাঠি। উত্তেজনায় আমাদের চোখের মণি বড় হয়ে গেছে। রক্ত আমাদের হৃৎপিণ্ডে দফ বাজাচ্ছে।

অনেক দূরে, অন্ধকার উদ্যানে দাঁড়িয়ে আছে সম্বর, ধূলি-ধূসরিত সাইপ্রেস ঝোপ, দুলছে এদিক-ওদিক মৃদুমন্দ ঐকান্তিকতায়। গেউলা খুব ক্লান্ত। সেই কারণেই সম্ভবত আমাদের বিদায় জানাতে আসেনি। কিন্তু তার আঙুলগুলো ধুলোতে আঁকিবুকি কাটছে, তার মুখমণ্ডল খুব শান্ত এবং তাকে প্রায় সুন্দরীই মনে হচ্ছে।

বিশ্বসাহিত্য
ছোটগল্প

ছাত্রজীবনে পাঠ্যপুস্তক পড়তে
হয়েছে বাধ্য হতে আমার এখন
পড়তে হয় অন্য ফল ভাষার
সাহিত্য এবং মননের সাথে
প্রাথমিক পরিচয়ের আশায়,
সেই পরিচয়টিকে ঘনিষ্ঠ করে
তোলার অন্তর্তাড়নায়।

এই বইতে আটটি গল্প থাকছে।
ফ্রানজ কাফকা এবং চিনুয়া
আচেবেকে বাদ দিলে অন্য পাঁচ
লেখক বাঙালি পাঠকসমাজে তেমন
পরিচিত নন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন
ইসরায়েলের অ্যামোস ওজ,
সেনেগালের সেমবেনে আউজমেন,
ইতালির নাতালিয়া গিনসবার্গ,
লিথুয়ানিয়ার ভ্যালদাস প্যাপেভিচ ও
ব্রিটিশ-আমেরিকান গ্রাহাম সুইফট।

অগ্রদূত
a book of agrodoot & company

সেকায়েপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট
২০১৩ শিক্ষা বছরে মাধ্যমিক স্তরের কর্মমূখি মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের জন্য মুদ্রিত

দশম শ্রেণির পুরস্কার

বিক্রির জন্য নয়